৯০- এর গণঅভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী : একটি বিশ্লেষণ

এম.ফিল. থিসিস

401587

GIFT

Dhaka University Library
401587

বন্দনা সাহা

রেজিঃ ১৪২/৯৩-৯৪

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

৯০- এর গণঅভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ঃ একটি বিশ্লেষণ

বন্দনা সাহা

401587

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তারিখ, ঢাকা

ডিসেম্বর, ২০০১ইং

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মণ

অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

RB
B
321.3
SHN

GIFT

Gratis

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ অভিসন্দর্ভটি গবেষকের নিজের রচনা। এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ প্রকাশের জন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি।

401587

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ডালেম চন্দ্র বর্মণ)

তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৯০- এর গণঅভ্যুত্থান ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ঃ একটি বিশ্লেষণ শিরোনামটি সম্পর্কে আমাকে প্রথমে যে উৎসাহিত করে তোলেন তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মণ। তাঁর অনুগ্রহ এবং অনুপ্রেরণায় ১৯৯৬-৯৭ সালে এই কাজে হাত দেই। স্যার অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাকে কাজটি সমাপ্ত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

আমার এই গবেষণা কাজে আরও অনেকের সহযোগিতা আমি পেয়েছি এবং তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যারা আমার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তারা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা রতন দাস ও জনাব আমান উল্লাহ্। এছাড়াও বিভিন্ন ভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমার প্রিয় মা, আমার স্বামী- আশুতোষ পাল ও আমার দুই ভাই গৌতম ও উত্তম। এই অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়েছি। এর জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণী।

ডিসেম্বর ২০০১ইং

বন্দনা সাহা

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট	১-২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	গণআন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের ভূমিকা	২৮-৩৮
তৃতীয় অধ্যায়	সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা	৩৯-৫৯
চতুর্থ অধ্যায়	পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন	৬০-৬৯
পঞ্চম অধ্যায়	সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা	৭০-৯২
ষষ্ঠ অধ্যায়	আন্দোলনে চূড়ান্ত পর্ব (৯০-এর গণঅভ্যুত্থান) অক্টোবর-ডিসেম্বর	৯৩-১০৭
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	১০৮-১২০
	তথ্যপঞ্জী	১২১-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

এরশাদ শাহীর আমলে দেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার একটি সঠিক চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরা দরকার। দেশের সামনে গণতান্ত্রিক বিকাশের যে সুযোগ পুনরায় উপস্থিত হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহারের জন্যই সে ব্যাপারে সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা উত্থাপনই আমার এই গবেষণার উদ্দেশ্য। ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ অনুমান নির্ভর হতে পারে না। তা অনুসন্ধান করতে হয়। সেই অনুসন্ধানের কাজটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে চাই।

প্রথমতঃ ভূমিকা এবং গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

দ্বিতীয়তঃ গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের ভূমিকা।

তৃতীয়তঃ সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা।

চতুর্থতঃ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা।

পঞ্চমতঃ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা।

ষষ্ঠতঃ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব ('৯০ এর গণঅভ্যুত্থান), অক্টোবর-ডিসেম্বর।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ এই অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক কাঠামো দাড় করানো হয়েছে এরশাদ শাহীর দীর্ঘ নয় বছরের কীর্তি কলাপে অতিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের। '৭১-এর মার্চ মাসে বাঙালী জাতি এক মহানায়কের যাদুস্পর্শে বাঙালী জাতীয়তাবাদী বিকাশের ধারায় সংঘঠিত হতে থাকে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সংসদ অধিবেশন বাতিলের ঘোষণার পর থেকেই বাঙালীর যে জাতীয় চেতনা তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল তা ধূলিস্যাত হতে শুরু করে। এর প্রেক্ষাপটেই মুক্তিযুদ্ধের সুচনা। সাধারণ মানুষ আশা করেছিল যে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অবসান ঘটবে। বাস্তবে কিন্তু সেসব আকাঙ্খা পূরণ হওয়ার কোন লক্ষনই দেখা গেল না।

এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই আমরা সেই সৃজনশীল প্রতিবাদী সময়কে বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি। নানা বিবৃতি, পত্র-পত্রিকার বিভিন্ন লেখকের বই ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১৯৯০ - এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট

পৃথিবীতে যুগে যুগে ক্ষমতার লোভে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে স্বৈরাশসনের আবির্ভাব ঘটেছে। এইসব স্বৈরশাসক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিরস্ত্রজনতাকে করেছে হত্যা, চালিয়েছে গুলি, অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্ট্রীমরোলার। আপাত সাফল্য লাভ করে ধরাকে সরাজ্ঞান করলেও এদের কারোরই শেষ রক্ষা হয়নি। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, সংগ্রামী জনতার জয় এবং স্বৈরশাসনের পতন অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসের এই অনিবার্য ধারাক্রমে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটেছে। সংগ্রামী জনতার বিজয় সূচিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এক অনন্য সাধারণ অধ্যায়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন ঘোষণা করে ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবৈধ দখলকারী এরশাদের পতন হয়েছে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মুখে।

১৯৭১-এ দেশবাসী মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানে আধা-ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে। বাঙালী জাতি আশা করেছিল দেশে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায় বিচার, আইনের শাসন ও শোষনহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। (বৃটিশ শাসকরা বিতাড়িত হবার পরও এই ভূ-খন্ডের মানুষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

করতে চেয়েছিল, নতুন রাষ্ট্রের শাসকদের কাছ থেকেও সে ধরনের প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানী আমলের ২৪ বছরে যে অল্প সময় অসামারিক শাসনের স্বাদ দেশবাসী পায় সে সময়টুকু এক মুহূর্তের জন্য অপশাসনমুক্ত ছিল না)। [আলী, ১৯৯০;১০]

'৯০- এর আন্দোলন ছাত্র সমাজের- এ ভূমিকার গৌরবোজ্জ্বল সূচনা ১৯৮২ সামরিক সরকারের ক্ষমতায় আহরনের পর থেকেই। '৮২-র জুনে প্যালেস্টাইন সংহতি দিবসে সামরিক আইনের কড়া নিরাপত্তা ভেঙ্গে বায়তুল মোকাররম এলাকায় প্রথম প্রতিবাদী মিছিল করে ছাত্র সমাজ। ৮২-র ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় করিডোরে শ্রেনীকক্ষে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর নির্মম হামলায় ঝাঁড়িয়ে পড়ে স্বৈরাচারের রক্ষকরা। অসংখ্য ছাত্রকে তখন কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সকল রকম নির্যাতনকে উপক্ষো করে ছাত্ররা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এরশাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। সামরিক সরকারের ধর্ম ও শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান গনবিরোধী শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়।

('৮৩-র ১৪ ফেব্রুয়ারী শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচীর মাধ্যমে ছাত্ররা প্রথম ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষা ভবন ঘেরাও আন্দোলনের সময় জাফর এবং জয়নুল আবেদীনসহ বেশ ক'জন ছাত্র নিহত হলে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা বেড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে জাফর, জয়নুল আবেদীন প্রমুখের হত্যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিকরা প্রথম বারের মতো প্রকাশ্যে ছাত্রদের সঙ্গে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেন এবং জাতীয় রাজনীতিতে এরশাদ বিরোধী জোটবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা হয়। [ইসলাম, ১৯৯০;১১,১২]

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে এরশাদ সরকার দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয়। প্রায় ছয়মাস বন্ধের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দশদফা দাবী নিয়ে জোর আন্দোলন শুরু করে। '৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পেটানো বাহিনী ঢাকার ফুলবাড়িয়ার ছাত্রদের একটি মিছিলের উপর ট্রোক উঠিয়ে দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেলিম এবং দেলোয়ার ট্রোক চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এই হত্যার প্রতিবাদে '৮৪ সালে পহেলা মার্চ দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশে তীব্র গণআন্দোলনের সূচনা হয়। সেই গণআন্দোলনের জোয়ারে বাংলার প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক জোটগুলোতে মেতে উঠে এবং স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশে নতুন করে স্বৈরাচারমুক্ত বিজয়ের পতাকা উড্ডয়ন করে। ১৯৮৩ সালে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সূচিত আন্দোলন নানাপথ পরিক্রম করে ধাপেধাপে ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। ঐদিন থেকে গণবিক্ষোভ গণআন্দোলনের মাত্রা পরিক্রম করে গণঅভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হয়। ছাত্র জনতার গন্ডীভূত ক্ষোভ সেসময় তীব্রতর হয় এবং বিদ্রোহী মানুষ জরুরী অবস্থা ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। প্রায় সর্বস্তরের পেশাজীবী সেসময় আন্দোলনের সাথে সংহতি এবং সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের মানুষের এই অভূতপূর্ব বিজয় গণআন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনগণ প্রমাণ করেছে কোন স্বৈরাচারী সরকারই জনসমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় থাকতে পারে না। দুর্বার আন্দোলনের মুখে স্বৈরাশাসনের পতন অনিবার্য। এ যেন ইতিহাসের অমোঘ ও অলংঘনীয় নিয়ম। স্বৈরাশাসনের বিরোধী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এছাড়াও সর্বস্তরের পেশাজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দসহ সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। স্বৈরশাসন অপরাজেয় ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তির কাছ ভুলুণ্ঠিত হয়ে শৃংখলমুক্ত বাংলাদেশের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গনতন্ত্রের লাল সূর্য উদিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে সংযুক্ত হয় এক উজ্বলতম অধ্যায়। মুক্তি পেয়েছে গণতন্ত্র। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের মানুষের গণতন্ত্রের আকাঙ্খা, আন্দোলন, আত্মাহুতি এবং সর্বশেষে বিজয় অন্যান্য দেশের মানুষকেও গনতন্ত্রের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের কোন বিকল্প নেই।

উনসত্তরের শতশত নামের ভীড়ে যেমন অধিক উজ্জ্বল হয়ে আছে আসাদ, মতিউর। নব্বইয়ের শত শহীদের নামের ভীড়ে তেমনি অধিক উজ্জ্বল মিলন ও জাহিদ। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১০ তারিখ সকালে মৃত জাহিদই সেই আন্দোলনকে বিকেলে নিয়ে গেল এক ভয়ংকর সুন্দর পথে। যে পথ দিয়ে একমাত্র বিজয়ের শেষ সিঁড়িতে পৌঁছান ছাড়া আর ফিরে আসার কোন পথ থাকলো না। ১১ তারিখ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, ১৪ অক্টোবর শোক মিছিল, ১৫ অক্টোবর মশাল মিছিলের এবং ১৬ অক্টোবর সারাদেশে হরতাল সফল করার আহ্বান জানানো হয়। ২২ অক্টোবর কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশ, ২৫ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ ও ২৮ অক্টোবর দেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস। এছাড়া আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, আইনজীবী সমিতি তাদের সভায় চলমান আন্দোলনের স্বপক্ষে জোরালো মতামত ব্যক্ত করে। এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে আন্দোলনে সকল শ্রেনীর বা পেশার অন্তর্ভূক্তি ঘটতে থাকে। কবি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, চিত্রকরসহ ৯০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই বিবৃতিতে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাজপথকেই একমাত্র পথ হিসেবে উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তারা বলেন স্বৈরাচারী সরকার নিয়মতান্ত্রিক সকল পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। এছাড়াও তিনজোট, ছাত্র ঐক্যসহ অন্যান্য ছোটখাট ডানবাম রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো শোক মিছিল বের করে। ন্যাপ কার্যালয়ে ছাত্র ঐক্যের এক জরুরী সভা বসে। ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র ঐক্য ৮দিন ব্যাপী কর্মসূচী ঘোষণা করে। স্বৈরাচারী এরশাদের পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ৮ ডিসেম্বর ছিল আনন্দ উল্লাস আর বিজয়ের জয়গানে মুখরিত। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বিজয়ের উৎসবের আয়োজন করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে মহানগরীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বস্তরের জনগন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয় এবং জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। টি,এস,সির ছাদ, আশেপাশের দেয়াল ও গাছের উপর উঠেও শতশত লোক অনুষ্ঠান উপভোগ করে। তারপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর ঘোষণাপত্র পাঠ করেন শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ্ কায়সারের কন্যা শমী কায়সার। এরপর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পাঁচ শিল্পী রফিকুল আলম, রথীন্দ্রনাথ রায়, খুরশীদ আলম, কল্যানী ঘোষ, সুবীর নন্দী 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল' গানটি গেয়ে শোনান, স্বরচিত কবিতাও পাঠ করেন দেশের ক'জন শীর্ষস্থানীয় কবি।

গণতন্ত্রের জন্যে এদেশের জনগণের যে আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কর্মীরা সর্বদাই সে আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে। শুধু সম্পৃক্ত নয় আন্দোলনকে গন্তব্যের দিক নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা পালন করেছেন এক বিশাল ভূমিকা। ফলে স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। ১৯৮২ থেকে এদেশের নতুন করে আন্দোলনের সূচনা ঘটে। রাজনৈতিক দলগুলো এবং ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

জনতা এ সরকারের পদত্যাগ দাবী করলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা সে দাবীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

(সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন কর্মীরা নিজেদের আন্দোলন বিস্তৃত করার জন্যে ১৯৮৫ সালে গঠন করেন 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট।) [ইসলাম, ১৯৯০;১৪।]

পরবর্তী সময়ে এই জোট এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সৃষ্ট আন্দোলনকে বেগবান করার জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক জোটের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন রেডিও, টেলিভিশন ও মঞ্চের নাট্য শিল্পী, গায়ক-গায়িকা, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, আবৃত্তিকার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের কর্মীরা। সর্বমোট ১১৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠন এই জোটের অন্তর্ভূক্ত যার আহ্বায়ক কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ।

১৯৮২ সালের সামরিক আইন শাসিত বাংলাদেশে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল ছায়ানট, থিয়েটার, উদীচী ও অন্যান্য সংগঠন। এই উদ্‌যাপন কমিটি গঠিত হয়েছিল সুফিয়া কামালকে আহ্বায়ক করে এবং শহীদ মিনারে ৩দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন হয়েছিল। এরশাদ শাহীর সূচনার সময়কালে তাই সংস্কৃতি অঙ্গনে যৌথ ও সমন্বিত কর্মকান্ড পরিচালনার একটি আবহ গড়ে উঠেছিল। এই পটভূমিকায় বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীদের পক্ষ থেকে ব্যাপক ভিত্তিক একুশে উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ১৯৮৩ সালের শুরুর দিকে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর বাসভবন ও উদীচী শিল্প গোষ্ঠীর কার্যালয়ে একাধিক সভা অনুষ্ঠানের পর সম্মিলিতভাবে একুশে উদ্‌যাপনের জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'একুশে উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৮৩' গঠন করা হয়। যেসব সংগঠন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে তাদের মধে ছিল ছায়ানট, উদীচী, ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী, বৈশাখী, সময়, নারায়নগঞ্জ উদীচী সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ, গন-শিল্পী সংস্থা, উন্মোচন, আওয়ামী শিল্পী গোষ্ঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল, নাগরিক, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, আরন্যক, ঢাকা পদাতিক, নাট্যচক্র, অন্বেষা, ঢাকা ড্রামা প্রভৃতি। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে এদেশের কবিগণও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত হয়েছিল বর্বর হত্যাকান্ড, এরশাদ শাহীর হাতে নিহত হয়েছিল জয়নাল সহ অজ্ঞাতনামা আরো অনেক শহীদ। নভেম্বর মাসে পুনরায় রক্তঝরে রাজপথে। তাই '৮৩ থেকে '৮৪তে এসে গণবিক্ষোভ ও আন্দোলন অর্জন করেছিল অধিকতর ব্যাপকতা। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল, সুন্দরের অতন্দ্রপ্রহরী, একুশ উদ্‌যাপনে সম্মিলিত অনুষ্ঠান মালার প্রবর্তনা করেছিল। সব মিলিয়ে শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীদের তৎপরতা হয়ে উঠেছিল অনেক সংহত। ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় একুশে উদ্‌যাপন কমিটিভূক্ত সংগঠন সমূহ মিলে গঠন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। (স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পাশাপাশি ফয়েজ আহ্‌মদের নেতৃত্বে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়। জরুরী আইন ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গের মাধ্যমে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গণবিক্ষোভের সূচনা করে। এদের সঙ্গে সর্বস্তরের পেশাজীবী সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সহ সর্বস্তরের পেশাজীবী নেমে আসে। স্বৈরশাসন অপরাজেয় ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তির কাছে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে।) [ইসলাম, ১৯৯০;১৭।]

১৯৮৩ সালে গঠিত হয়েছিল চিত্রকরদের একক সংগঠন চারুশিল্পী সংসদ। আলমগীর কবীরকে কেন্দ্র করে তরুন চলচিত্র সংসদকর্মী ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র নির্মাণ অভিলাষীরা গড়ে তুলেছিলেন শর্ট ফিল্ম ফোরাম। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে জন্ম নিয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় কবিতা পরিষদ। স্বৈরাচার সংস্কৃতি বিনাশ করতে পারে, সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে। তাই স্বৈরাচার জাতির ইতিহাসে যেমন কলঙ্কজনক অধ্যায় তেমনি প্রোজ্জল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সময়কাল। ৪ ডিসেম্বর এরশাদ শাহীর পতনের পর পর 'জনতার জয় সম্প্রসারের কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেছিল শিল্পী সমাজ। এবারের গণআন্দোলন সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের সাথে দেশের সংস্কৃতি কর্মীরা যে অবদান রেখেছিল জাতি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। সংস্কৃতিকর্মী শিমুল ইউসুফ, শংকর সাওজাল এবং আরও কয়েকজন তরুন শিল্পীরা 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা', এই গানটি দিয়ে লাখ মানুষের মুহুমুর্হু করতালী আর উল্লাসের মধ্য দিয়ে জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। এরপর সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ইত্যাদি প্রচারিত হতে হতে ভোরের সুর্য উদিত হয়। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গ নাট্যাংশ পরিবেশন করে বিভিন্ন সংগঠন। যার ফলে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটেছে। আর এই পতন ঘটানো সম্ভব হয়েছে ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষ করে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন মনোভাবের জন্যই।

যে কোন ধরনের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিবাদ করার ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের। অদূর অতীতে ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দেশের কবি শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেন রাজনৈতিক দলগুলোর আগেই। ১৯৮৩-র ১৯ জানুয়ারী "ঐক্যবদ্ধভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের আহ্বান জানিয়ে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী পত্র-পত্রিকায় একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তারা বলেন- মহান একুশে ফেব্রুয়ারী সমাগত। আজ থেকে ৩১ বছর আগে আমাদের ভাষা সংস্কৃতি তথা জাতি সত্তার উপর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়ার আঘাত প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি তথা জাতীয় অগ্রগতি নিস্কন্টক নয়। প্রতিক্রিয়া ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা আজও চক্রান্তে লিপ্ত। অপসংস্কৃতির প্রসার ও রক্ষনশীলতার পরিশোষণের ফলে শিল্প ও সংস্কৃতি জগত বিপর্যস্ত হতে চলেছে। অর্থনৈতিক সংকট আজ ব্যাপক জনগনের জীবনে চরম দুর্দশা প্রতিদিন গভীরতর করে তুলছে। ব্যাহত হচ্ছে স্বাধীন জাতীয় চেতনা বিকাশের লক্ষ্য।

১৯৮৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আমাদের জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আর সেইজন্য আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলোকে রক্ষার চেতনা পুনরায় শানিত করে তোলার জন্য সকল সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কতিক সংগঠন সমুহের নিকট আবেদন জানানো হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, সুফিয়া কামাল, ডঃ আবু মাহ্মুদ, ডঃ মোজাফফর আহমেদ, কবির চৌধুরী, ডঃ আখলাকুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম, শেখ লুফর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ মুস্তাফা নুরুল ইসলাম, ডঃ মুহম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ রফিকুল ইসলাম, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, গোলাম মুস্তাফা এবং কলিম শরাফী। (৪৩টি প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল 'একুশে উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৮৪'। অতঃপর এগুলোর সঙ্গে আরো সংগঠন যুক্ত হয়ে ৮৪'তে গঠিত হয় ৪৭টি সংগঠনের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। এই সংগঠনের মধ্যে ছিলেন সাহিত্য সেবী, সংগীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী, নাট্যশিল্পী এবং ঢাকা ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল সমূহের কর্মীগন। [আলী, ১৯৯০;১৯]

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির শ্লোগান ছিল- "প্রতিরোধ করো প্রতিক্রিয়া, রুখে দাঁড়াও স্বৈরাচার।" সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরণ্যক নাট্যদল, আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যা নিকেতন, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গণছায়া, গণশিল্পী সংস্থা, চারু ও চারুকলা ইনষ্টিটিউট ছাত্র সংসদ, ছায়ানট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক গোট, ডাকসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল, ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা পদাতিক, থিয়েটার নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়, নান্দনিক, পদাতিক বাংলাদেশ থেকে ইউনিয়ন, প্রাক্সিস অধ্যয়ন সমিতি, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, সংগ্রামী সাংস্কৃতিক জোট প্রভৃতি।

এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের ভুমিকাও উল্লেখযোগ্য। পেশাজীবীদের মধ্যে শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাধারণ চাকুরীজীবি, আমলা ও কমচারী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষও রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর তৎকালীন প্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮১ সালে তৎকালীন বেসামরিক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কিত এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ ও গুরুত্ব অর্জন করেন। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ মাল পর্যন্দ বাংলাদেশের আর এক প্রত্যক্ষ। পরোক্ষ সামরিকশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর (৩০মে ১৯৮১) পর তার উত্তরসূরী উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার ও ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। এ অবস্থায় ধারণা করা হয় যে বিচারপতি সাত্তার ও তার বিএনপি সরকার সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

জিয়ার মৃত্যুর পর জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে সংবিধান রক্ষায় সেনাবাহিনীকে ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি সাত্তার সেনাবাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি সাত্তার সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, যে জাতীয় ইতিহাসে এ নজির স্বর্নাক্ষরে লেখা থাকবে। কিন্তু কিন্তু রাষ্ট্রপতি সাত্তারের দুর্বল নেতৃত্ব, অনুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, বয়োবৃদ্ধতা ও সার্বক্ষনিক দলীয় অন্তকলহ রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতার সৃষ্টি করে। এই সুযোগ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য জেনারেল এরশাদ মুক্তিযুদ্ধে ও জাতি গঠনে সেনাবাহিনীর অবদানের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব দাবী করে বিবৃতি বক্তব্য দিতে শুরু করেন। তিনি ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাসের Peter Nieswand এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, The army should be directly associated with the government of the country which might fulfil the ambition of the army and might not lead to further corps. সাত্তার চাপের মুখে এ দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করলেও পরে এরশাদের দাবীর সঙ্গে তার নীতিমালার সমন্বয় করতে রাজী হন এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতির সমন্বয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ (National Security Council) গঠন করেন। জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের বিরোধীতা করে আওয়ামী লীগ এটাকে উপরি অধি সরকার (Supra Government) বলে সমালোচনা করে। কিন্তু এই কাউন্সিল গঠনের পরও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বিএনপির অন্তকলহ ব্যাপক আকার ধারন করে। এরশাদ সেনাবাহিনীর দাবী পুনরায় উত্তাপন করে - বিএনপি'র দূর্নীতিবাজ মন্ত্রী ও রাজনৈতিকদের বহিস্কার করে এমন একটি সরকার গঠনের জন্যে বিচারপতি সাত্তারকে পরামর্শ দেন যে এমন একটি সরকার গঠন করতে হবে যারা দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করবে। জেনারেল এরশাদের দাবীর সঙ্গে সমন্বয় করে

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি সাত্তার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন এবং কিছু মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুনরায় নতুন মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে দেন এবং কিছু মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুনরায় নতুন মন্ত্রী সভা গঠন করেন। কিন্তু তখন কার্যত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। সামরিক বাহিনীর উপর বিচারপতি সাত্তারের নির্ভরশীলতার জন্যে সুযোগ পেয়ে জেনারেল এরশাদ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারকে নিয়োগ দিয়ে নিজের হাতকে শক্তিশালী করেন এবং রাষ্ট্রযন্ত্র নিজের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসেন। অপরদিকে মন্ত্রী সভার সদস্যদের দুর্নীতি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, দেশে অপ্রতুল খাদ্য সরবরাহ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি অভিযোগ এনে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে দায়ী এবং ব্যর্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ফলে রাষ্ট্রপতি সাত্তার এবং সেনা প্রধান এরশাদের মধ্যে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। উপরাষ্ট্রপতি এম এন হুদা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে চাকুরী বিধি লংঘনের দায়ে সেনা প্রধানের পদ থেকে জেনারেল এরশাদকে অপসারন করে মেজর জেনারেল সামসুজ্জামানকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগের জন্যে রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পরামর্শ দেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির আদেশটি বাস্তবায়নের আগেই রাষ্ট্রপতি সাত্তারের তথ্যমন্ত্রী সামসুল হুদা চৌধুরী তথ্যটি জেনারেল এরশাদকে গোপনে অবহিত করেন।

এদিকে অভ্যন্তরীন বিরোধের কারণে বিএনপি সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তারা সংহতি ও সহনশীলতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। ফলে ক্ষুব্ধ ও ক্ষমতা লিপ্সু জেনারেল এরশাদ যিনি গভীরভাবে এসব ঘটনা অবলোকন করেছিলেন, ক্ষমতা দখলের সুযোগ পেয়ে গেলেন। কালক্ষেপন না করে তিনি দ্রুত অগ্রসর হলেন এবং তার ঘনিষ্ট সামরিক সহযোগিদের তাৎক্ষনিক এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৮২ সনে লেঃ জেনারেল এরশাদ বলপূর্বক রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার চূড়ান্ত আকাঙ্খা পুরণ করেন। এভাবে একটা বেসামরিক নির্বাচিত সরকারকে বিনা রক্তপাতে উৎখাত করে জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ঐদিন সামরিক আইন জারি করে। সামরিক আইনের ঘোষণায় বলা হয় দেশের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বহু কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের অধীনে ন্যস্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জনগন ও দেশের প্রতি তাদের কর্তব্যের অংশ হিসেবে দেশের স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর বর্তেছে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা বলে ২৪ মার্চ '৮২ থেকে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল ও পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহন প্রশাসক দেশের সশস্ত্র বাহিনীর পুর্ন কমান্ড ও নিয়ন্ত্রন গ্রহন করেছেন। দেশের সংবিধান স্থগিত রাখা হয়েছে। জাতীয় সংসদ বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সামরিক আইন জারির সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার আর তাদের পদে বহাল নেই এবং মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক একটি উপদেষ্টা পরিষদ অথবা মন্ত্রী পরিষদ নিয়োগ করবেন। তারা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সরকার প্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে সাহায্য ও পরামর্শ দেবেন। তিনি আরো বলেন, দেশে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বেসামরিক প্রশাসন কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না। সকল পর্যায়ে ব্যাপক দুর্নীতির দরুন জনজীবনে অসহনীয় কষ্ট ও দুদর্শার সৃষ্টি হয়েছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবনতিতে শান্তি-শৃংখলা, স্থিতিশীলতা এবং সম্মানের সঙ্গে জীবন যাত্রা নির্বাহ হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য উপক্ষো করে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরে ক্ষমতার কোন্দল জাতীয় নিরাপত্তা

Dhaka University Institutional Repository

ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। দেশের জনগন এক হতাশা, নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত হয়েছে। নৌবাহিনীর ষ্টাফ প্রধান রিয়াল এডমিরাল মাহবুব আলীখান এবং বিমান বাহিনীর ষ্টাফ প্রধান এয়ারভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণার পর ঐদিনই ২৪শে মার্চ, ৮২ ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার বেতার ও টেলিভিশনে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "দেশের আইন শৃংখলা অর্থনীতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর এই মহান প্রচেষ্টায় আমি সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। জাতির প্রয়োজনে দেশে আমি যে কোন কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না। উল্লেখ্য কি পরিস্থতিতে সাত্তারকে দিয়ে এই ভাষণটি দেয়ানো হয়েছিল তা মৃত্যুর আগে তিনি কয়েকবার বলেছেন। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়।

গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল এরশাদ জাতিকে বলেন যে সব দল বা তৃতীয় বিশ্বের সামরিক হস্তক্ষেপকারী প্রতিটি একনায়েকেরই স্বতঃসিদ্ধ ও গতানুগতিক প্রবচন। ক্ষমতাসীন হয়েই জেনারেল এরশাদ তার পূর্বসুরী আর এক সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন। তিনি মৌলিক অধিকারসহ সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করেন। সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। তিনি তার সামরিক অভ্যুত্থানকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্যে দূর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদী কার্যক্রম ঘোষণা করেন। এসব কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সাবেক আমলের কিছু মন্ত্রী, আমলা ও

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও বিচারের ব্যবস্থা। তিনি জেনারেল জিয়া প্রবর্তিত গ্রাম সরকার, যুবকমপ্লেক্স, গণ-স্বাক্ষরতা ও খাল খনন কমূর্সচী বাতিল ঘোষণা করলেও জেনালে জিয়া কর্তৃক সংবিধানে সংযোজিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম' আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস এবং সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজতন্ত্র সংবিধান থেকে বাতিল করেননি। বরং তিনি ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্যে জেনারেল জিয়া থেকেও একধাপ এগিয়ে যান, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষনা ও মসজিদ প্রীতির ছদ্মবেশ ধারণ করে। এছাড়া ক্ষমতা সংহত করার জন্যে জেনারেল এরশাদ যেসব পদক্ষেপ গ্রহন করেন তার সবগুলোই ছিল তার পূর্বসূরী জেনারেল জিয়ার গৃহিত কার্যক্রমের অনুরূপ।

জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার ক্ষমতা বৈধকরণ ও সংহতকরণের লক্ষ্যে একটি 'বেসামরিক লেবাস' প্রদানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন। বাঙালী জনগোষ্ঠীর অতিমাত্রায় রাজনৈতিক প্রবণতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনীতিকদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জেনারেল এরশাদ তার পূর্বসূরী জেনারেল জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদ এবং পরবর্তী ক্যাবিনেট সমূহে বেশকিছু বেসামরিক আমলা, বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিককে অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বারবার জনগণকে আশ্বাস দেন যে, গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সামাজিক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চয়তা হবে। অপরদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক শাসনের মধ্যেও অল্প বিস্তর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কর্মসূচী শুরু করে এবং ধীরে ধীরে আবেগবান হতে থাকে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবাদী ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়াতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ছাত্র কর্মীরা তাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসে এবং সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করে। এর ফলে অনেক সহিংস ঘটনা ঘটে। বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রী

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ হারায়, শত শত ছাত্র আহত হয়। উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে অনেকবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা সান্ধ্য আইন জারী, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বারবার বন্ধ ঘোষণা, ছাত্রদের হলত্যাগে বাধ্য করা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ ছাত্র নেতাদের গ্রেফতার, সংবাদপত্রের উপর বিধি নিষেধ আরোপ এবং আরো অনেক দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করে। এসব অব্যাহত দমননীতি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংগঠিত তৎপরতা অব্যাহত রাখে। সামরিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনগুলোও এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে ক্রমেই যোগদান ও সোচ্চার হতে থাকে। রাজনৈতিকদল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে আদর্শগত ও কর্মসূচীগত এবং বুৎপত্তিগত বিরোধ সত্ত্বেও জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোও জোট বেধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। এরশাদের পদত্যাগ, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবীতে ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক পেশাজীবী সংগঠনগুলো বিভিন্ন জোট গড়ে আন্দোলন চালাতে থাকে।

এদিকে এরশাদ একদিকে সমঝোতার ছলাকলা এবং দমননীতি ও তার রাজনৈতিক ভীত শক্ত করার কৌশল গ্রহণ করেন। আর সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৮৩ সালে ডিসেম্বরে ইউপি নির্বাচন, '৮৪ সালে পৌরসভা নির্বাচন, সন্ত্রাস-হতার অসংখ্য অভিযোগের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেন। নব নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর সভার সদস্যবৃন্দ প্রাথমিক দপ্তর থেকে সরকারকে সমর্থন দেবে- এই প্রত্যাশা নিয়ে জেনারেল এরশাদ তার নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন চেয়ে ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে এক গণভোটের আয়োজন করেন। রাজনৈতিক দলগুলো এই গণভোট প্রত্যাখ্যান করে। গণভোটে অংশগ্রহণ ছিল নেতিবাচক- একটি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেব মতে শতকরা ৩ ভাগেরও কম। লন্ডনস স্টাইমস তার প্রকাশিত রিপোর্টে এ গনভোটকে জুয়োচ্চর বলে অভিহিত করে। এরপর জেনারেল এরশাদ তার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান এবং ১৯৮৫ সনের মে মাসে ৪৬০টি উপজেলা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। সন্ত্রাস,ছুরিকাঘাত, বোমবাজি,ব্যালটবাক্স ছিনতাই এবং অসংখ্য আহত নিহতের ঘটনা ঘটে। এসব নির্বাচনের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় কিছু জনসমর্থন লাভে সক্ষম হন এবং বিরাধী দলকে মোকাবেলার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেত থাকেন। বিভিন্ন দল থেকে নেতা কর্মী বাগিয়ে এবং দল ভেঙ্গে ছোট ছোট কিছু দলকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও প্রলোভন দিয়ে তারকাছে টেনে আনেন এবং "জনদল" গঠন করেন। গঠন করেন নতুন বাংলা যুবসমাজ, নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ, এবং স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। এসব সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসামরিক সমর্থন জোরদার করা। "জনদল নামক একটি জগাখিচুড়ি সংগঠন গড়ে উঠার পর ছাত্র, যুবও শ্রমিক সংগঠনগুলো এর অঙ্গ সংগঠন রুপ নেয়। কিন্তু এরশাদ এতে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তবে এ সংগঠনের নেতাদের তিনি মন্ত্রীসভায় স্থান দেন। জেনারেল এরশাদ যে শক্তিশালী বেসামরিক ভিত্তি চাচ্ছিলেন জেনারেল জিয়ার জাগদলের মতো জনদলও সেই প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ হয়। আরো ব্যাপক গনভিত্তিক একটি সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে জেনারেল এরশাদ জিয়ার অনুকরনে "জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের" মতো গঠন করেন "জাতীয় ফ্রন্ট"। ইতিমধ্যেই জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করেন। এবং ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচী ঘোষনা করেন। তিনি ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে"জাতীয় পার্টী" গঠন করেন এবং নিজেই তার নেতৃত্ব ভার গ্রহনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক শাসনের একটি"বেসামরিকলেবাস" তৈরী করেন। যেমনটি করেছিলেন তার

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বসূরী জেনারেল জিয়াউর রহমান বিএনপি গঠনের মাধ্যমে। অন্যভাবে বলা যায় এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং জিয়ার বিএনপি বিবর্তন প্রায় একই ধারায়।

এদিকে পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালে সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেও শেষ মুহূর্তে এসে আওয়ামীলীগ সহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনের অংশ নেয়। বিএনপি স্থগিত সংবিধানের ৬৬ধারার অধীনে "নৈতিকস্খনের জন্য" সামরিক সরকার কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের নির্বাচনের অংশগ্রহনের অধিকার সম্বলিত একটি অতিরিক্ত দাবী তোলে। যৌথভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদকে পর্যুদস্ত করার ব্যাপারে আওয়ামীলীগ ও বিএনপির মধ্যে নির্বাচনের অংশ গ্রহন ও আসন ভাগাভাগির ব্যাপারে ঐক্যমত্য হবার পরও শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক কারনে বিএনপি নির্বাচন থেকে সরে দাড়ায়। আর এই নির্বাচনে অংশ গ্রহনের ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়ায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীণ ১৫ দলীয় ঐক্যজোট থেকে বামপন্থী ৫দল বেরিয়ে যায় এবং রাজপথে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে মুল লড়াই হয় আওয়ামীলীগ এবং জাতীয় পার্টির মধ্যে। ১৯৮৬ সালের ৭মে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে অংশ নেয় ২৮টি দল। জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আওয়ামীলীগ ৭৬টি, জামাত ১০টি, সিপিবি ৫টি, মুসলিমলীগ ৪টি, এনডিপি ৫, ন্যাপ বাকশাল ৩টি, জাসদ(রব) ৪টি, আসন লাভ করে। তবে এই নির্বাচনীফল আওয়ামীলীগ মিডিয়া ক্যু ভোট ডাকাতী হিসাবে চিহ্নিত করে। বিরোধী দল কর্তৃক আমন্ত্রিত একটি বৃটিশ প্রতিনিধি দল এই নির্বাচনকে "গনতন্ত্রের জন্য একটি বিয়োগান্ত ঘটনা" বলে বর্ণনা করেন। এরপর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আন্দোলরত বিরোধী দলগুলো বর্জন করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পুনরায় তুঙ্গে পৌছলে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংসদ বাতিল করেন এবং সংবিধান

Dhaka University Institutional Repository

অনুযায়ী তিন মাসের মধ্যে আর একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন আওয়ামীলীগ, বিএনপি, বামজোট ও জামাতসহ অধিকাংশদল বর্জন করলে জেনারেল এরশাদের বেসামরিক বৈধকরন প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে "লন্ডন টাইসস"পত্রিকা মন্তব্য করে যে, রাষ্ট্রপতি এরশাদ ৬ বছর আগে ক্ষমতা গ্রহনের জনসমর্থন লাভের যে চেষ্টা করে আসছেন এখন তা বিপজ্জনক না হলেও নাটকিয় মোড় নিয়েছে। তারমূল কৌশল ছিল একটি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের সমর্থন আদায় করা। কিন্তু অতিসাম্প্রতিক কালের ৩ মার্চের নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি যে গ্রহন যোগ্যতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়। জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকারের বেসামরিক বৈধকরন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষেত্রে জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার জাতীয় পার্টি ও গনভিক্তিক রুপ নিতে ব্যর্থ হয়। তবে এরাশাদ তার পূর্বসূরী জিয়ার মতো দেশব্যাপী ব্যাপক ঘুরে বেড়িয়েছেন, সভাসমাবেস করেছেন। ফলে কিছুটা হলেও তার দল ছাড়াই ব্যক্তিগত ইমেজ তার কিছুটা গড়ে উঠে। ফলে জাতীয় পার্টির নেতাদের ক্ষমতা ও দলের উৎস পড়েন জেনারেল এরশাদ। আর জেনারেল এরশাদও সুস্পষ্টভাবে বুঝে গেলেন যে, একমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়াই তার জন্য উত্তম এবং ক্ষমতার ভাঙ্গা গড়ায় সেনাবাহিনীই হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। তার ধারনায় সেনবাহিনী যতদিন তাকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে চায় তিনি ততদিনই ক্ষমতায় টিকে থাকবেন।

৪ মে, ৮৭ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখহাসিনা ও ২৮ জন বিশিষ্টি বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন মহল পবিত্র রমজান মাসে হোটেল-রেস্তোরা বন্ধ রাখার নির্দেশের নিন্দা করেন। শেখ হাসিনা রমজানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বলেন, ইসলামের প্রতি অনুরাগের কারনে নয় বরং ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যেই সরকার সকল খাবারের দোকান রমজান মাসে বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধের আদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জারী করেছেন। ঐ আদেশ জারী করার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এসকল খাবারের দোকানে শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য মানুষ খাবার গ্রহন করে থাকেন। তিনি আরও বলেন, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে হোটেল রেস্তোরা কর্মরত হাজার হাজার কর্মচারী ও তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবার। বুদ্ধিজীবীরা বলেন, আমরা রমজান মাসের পবিত্রতার প্রতি সমান প্রদর্শন করেই মনে করি এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের নামে স্বৈরাচারী উদ্যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দেশ-বিদেশ মানুষ জানে রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিজেকে একজন কবি বলে প্রচার করে তৃপ্তি পেতেন। কোন এক মহেন্দ্রক্ষনে "বিচিত্রায় বেরিয়েছিল তার এক কবিতা, তারপর থেকে তিনি হয়ে উঠেন কবি। দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় রচিত হতো তার কবিতা। তিনি কয়েকজন কবিকেও জুটিয়েফেলেছিলেন তার সঙ্গীরুপে। এই বিষয়টি দেশের সত্যিকার কবিদের বিরক্তির উদ্রেক করে। এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে এদেশের কবিগন প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী,৮৭ প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসব হয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখের সড়ক মোহনায় দুইদিন ব্যাপী। উৎসবের শ্লোগান ছিল-"শৃংখল মুক্তির জন্য কবিতা"। ২রা ফেব্রুয়ারী, ৮৮ দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসব হয়। শ্লোগান ছিল- "স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা"। চলমান গনআন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে উৎসব শুরু ও শেষ হয়।অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি বলেন, "এটা নিছক উৎসব নয়"। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভুমিকা গ্রহনের জন্য কবিদের অভিনন্দন জানানো হয়। শামসুর রহমান বলেন,"যে সরকারের কাছে গনতন্ত্রের কানাকড়ি মূল্য নেই, যে সরকারের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য অস্বীকৃত সে সরকারের সাথে কোন আপোষ নেই"। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের শেষ অুষ্ঠানের সভাপতি মৃত্যুর কিছুক্ষন আগে কামরুল হাসান এঁকেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের একটি কার্টুন, নীচে লিখেছিলেন,"দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে"।

২ফেব্রুয়ারী,৮৯ "সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা" শ্লোগান দিয়ে জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শামসুর রহমান। ডঃ আহমদ শরীফ কবি ও সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আর প্রতিরাদ নয় আজ প্রয়োজন প্রতিরোধ। ১ ফেব্রুয়ারী, ৯০। "কবিতা রুখবেই সন্ত্রাস"- এই শ্লোগান দিয়ে চতুর্থ জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষনে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, স্বৈরাচার , মৌলবাদ ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এই শ্লোগান এক নতুন উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছে। সভাপতি শাসমুর রহমান বলেন, আমাদের মাতৃভূমিতে আজ চলছে নানা অন্যায় অবিচার। দেশকে মধ্যযুগে চালান করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে সরকার। স্বৈরাচার বিরোধী প্রত্যয় নিয়ে গনআন্দোলনের একাত্মতা ঘোষনা করে একটি মিছিল বের করেন কবি ও সংস্কৃতিকর্মীগন।

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন জারীর পর ছাত্ররাই ১৯৮২ সালে প্রথম প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিলেন। পিছিয়ে ছিল রাজনৈতিক দলগুলো। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজের ভূমিকা যেমন অগ্রগামী ছিল এরশাদ বিরোধী আন্দোলও তারা আবারো অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করে। এগিয়ে আসে বিভিন্ন শ্রেনী, পেশার সংগঠন ও সংস্কৃতি কর্মীরা। এরশাদ বিরোধী এই আন্দোলনে ছাত্র, পেশাজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীরা শুধু অগ্রনী ভূমিকাই রাজপথে পালন করেনি। তারা এরশাদের পতন, রাজনৈতিক দলগুলোকে জোট বদ্ধ করা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য করা, রাজপথের আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিনতির দিকে টেনে নেয়া এবং বিজয়ের চূড়ান্ত সোপান বিরোধী আন্দোলন তাদের এই

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ত্যাগ জীবন দান ও সাহসী সংগ্রামী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং শ্রেনী পেশাজীবীদের অংশগ্রহনে এরশাদের নতুন বাংলা গড়ার প্রয়োজকদের ভীত নড়ে গেল। এরশাদ অস্ত্রদিয়ে সব কিছু গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন জয় করতে। এরশাদের স্বৈরশাসন সন্ত্রাস এবং অস্ত্র, হত্যা ও নির্যাতনের রাজপথের সাহসী বিবেক সৈনিকদের তেজদীপ্ত করেছিলেন যেন বারুদে অগ্নি সংযোগ। রাজনৈতিক দলসহ সমসাজের সর্বস্তরের জনগন তাদের সন্তানদের রাজপথে রক্ষা করতে নেমে এলেন, নেমে এলেন নিজেদের রক্ষা করতে , দেশ রক্ষা করতে। ফলে এরশাদের ৯ বছর স্বৈরশাসন মুক্তহয় বাংলাদেশ।

১ অক্টোবর, '৯০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের ডাকে একছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ, শিক্ষা উপকরনের মূল্যহ্রাস, চাকুরীর সময়সীমা ৩০ বছর ধার্য করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষাসহ ১২ দফা দাবী এই কনভেনশন থেকে উত্থাপন করা হয়। এই ১২ দফার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষের ৪২ টি দাবী ছিল । ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট মিলায়তনে অনুষ্ঠিত এই কনভেশন ২৬৮টি কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৩১ জন ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি অংশ নেন। ১০ অক্টোবর, ৯০। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনূযায়ী ৮, ৭,ও ৫ দলীয় জোট সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচী পালন করে। গুলিতে নিহত হয় জেহাদ। জেহাদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার পর গোটা ক্যাম্পাস প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং দলীয় মতাদর্শ তারা ভুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাকসু সহ ২২টি ছাত্র সংগঠন মিলিত হয়ে গঠন করে "সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য"। ১৬ অক্টোবর, ৯০ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

জনতা পুলিশ সংঘর্ষ হয়। সড়ক ও রেল যোগাযোগে অচল অবস্থা এবং চট্রগ্রামে ১৫জন আহত হয়। ৪নভেম্বর থেকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজধানীতে ছাত্রশান্তি মিছিল হয়, মিছিলের উপর হামলায় নেতাসহ ২০জন আহত হয়। ছাত্রঐক্য ১৭ নভেম্বর ৯০, মন্ত্রীপাড়া অর্থাৎ বেলী রোড, মিন্টু রোড প্রভৃতি ঘেরাও,ব্যাপক সংঘর্ষ গুলি, ভাংচুর আরম্ভ করে এবং সারাদেশে ছাত্রঐক্যের "গনদুশমন প্রতিরোধ দিবস" পালিত সংঘর্ষে ৬৩ জন আহত হয়। সরকার হাজার হাজার বিডিআর পুলিশ মোতায়েন করেন।

১৯ নভেম্বর ৯০। ৭, ৮,ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট চলমান আন্দোলনের একটি তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়ে পূর্ণ গনতন্ত্রে উত্তরনের উপায় নির্দেশ করে একটি ঐতিহাসিকযুক্ত ঘোষনা দেয়। এই ঘোষনায় বর্তমান সরকারের গঠন পদ্ধতি সেই সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত সরকারের রুপরেখার স্পষ্ট চিত্র দেয়া হয়। ২৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রচন্ড গোলাগুলি হয়। গোলাগুলিতে নিমাই নামে একজন যুবক নিহত হয়। এবং আহত হয় আরও ৭জন। মাইক্রোবাস, জীপ ও মোটর সাইকেল আরোহী একদল সশস্ত্র যুবক দুপুরে ক্যাম্পাসের দখল নেয়ার চেষ্টা করলে গোলাগুলি শুরু হয়। বিক্ষিপ্তভাবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গোলাগুলি অব্যাহত থাকে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং সাধারন ছাত্রদের ধাওয়ার মুখে সশস্ত্র যুবকরা সোয়া সাতটার দিকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা যুবকদের ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য অভিযোগ করে যে গাড়ীর আরোহী সশস্ত্র যুবকরা ছিল "নিরু-অভি"গ্রুপের সমর্থক। ১ ডিসেম্বর, ৯০ সমস্ত সংবাদ পত্র বন্ধ ঘোষনা করা হল। মিরপুর হরতালের সমর্থনে জনতার মিছিলে বিডিআর এর গুলি বর্ষনে ঘটনাস্থলেই ৫জন নিহত হয় এবং পরে আরও নিহত হয় ২জন। সারা দেশে নিহত হয় আরও অনেক। গুরুতর আহত হয়

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রলীগ নেতা সফি। ঐদিন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকজন বিটিভির সংবাদ পাঠক ও ঘোষককে আন্দোলনের মধ্যে কাজ করার জন্য কালো তালিকা ভূক্ত করা হয়। ৪ ডিসেম্বর রাতে বেতার, টিভিতে এরশাদের ভাষনে দেখা যায় নয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রাজপথে লাখো জনতার মিছিল নেমে আসে। ৩ জোট অবিলম্বে এরশাদের পদত্যাগ দাবী করে এবং প্রেস ক্লাবের সামনে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার অবিরাম মিছিল চলতে থাকে। সকল ঘটনা ঘটে যেতে থাকে দ্রুত। বিকেলে ৩ জোটের পৃথক পৃথক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্থান,ও নূর হোসেন স্কোয়ারে।

ঐদিন রাত দশটার ইংরেজী সংবাদের শেষে এরশাদের পদত্যাগের নাটকীয় ঘোষনা শোনা যায়। শোনা মাত্র লাখ জনতার রাজপথে বিজয় ও আনন্দ মিছিল। ৫ ডিসেম্বর তিন জোটের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে প্রধান বিচারপতি শাহ্বুদ্দিন আহমদ উপ-রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হন। দেশের সর্বত্র বিজয় মিছিল, রাজপথে বিজয় উৎসব শুরু হয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(আইন-শৃংখলা) অধ্যাদেশ সহ সকল কালা কানুন বাতিল এবং ছাত্র,যুবক, মহিলা, কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, আইনজীবী, সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রকৌশল, কৃষিবিদ, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষকসহ সকল পেশার জনগনের দাবী সমূহ বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়। ৬ ডিসেম্বর উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদের পদত্যাগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে বিচারপতি শাহবুদ্দিনের দায়িত্ব গ্রহন এবং বিচারপতি হাবিবুর রহমান হন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি।

সকল দেশের সামরিক বাহিনীই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারধরন ও মাত্রাভেদে কিছু না কিছু ভুমিকা পালন করে থাকে। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব, অস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার, কারিগরী ক্ষমতা ও

Dhaka University Institutional Repository

সাংগঠনিক অনন্যতার কারনেই তাদেরকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করাযায়না। সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে কর্তৃত্ববাদী এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা। এলক্ষ্যে তিনি প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচী চালু করেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলগুলিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেন। জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং জতীয় পর্যায়ে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। যদিও তার ক্ষমতা গ্রহনকে একটা "প্রতিক্রিয়াশীল ক্যু" বলেই অভিহিত করা হয়। এ বক্তব্যের যথার্থতা এখানেই যে জেনারেল এরশাদ শুধু একটা নির্বচিত সরকারকে উৎখাত করেই ক্ষমতা দখল করেননি, উপরন্তু তিনি জনসমর্থিত অনুমোদনসিদ্ধ একটা গ্রহন যোগ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত করেত ব্যর্থ হন। যে তিনটি জাতীয় নির্বাচন তার সমরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় তার প্রায় সবকটাই বিরোধী দলগুলো বর্জন করে অথবা ভোটারদের অংশগ্রহন ছিল নগন্য। তদুপরি নির্বাচনগুলোর ফলাফল ও বির্তকিত রয়েই যায়। জেনারেল এরশাদ তার জাতীয় পার্টিকে আদর্শ ভিত্তিক একটা কার্যকর রাজনৈতিক বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বহুলাংশে ব্যর্থ হন। রাজনীতি বিমুখ আচরন এবং দলগঠনে অনাগ্রহ তার বেসামরিক সহকর্মীদের অনেকেই হতাশ হয়েছেন। এ কারনেই বলা যেতে পারে যে, নির্বাচন আয়োজন ও দলগঠনে প্রচেষ্টার মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ তার সরকারের বৈধতা অর্জন ও অংশগ্রহনের সংকট কাটিয়ে দেশে রানৈতিক স্থিতি আনয়নসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বহুসংখ্যক সামরিক অফিসারকে বেসামরিক দায়িত্বে নিয়োগ দানের ফলে সরকারও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সামরিক বেসামরিক দ্বন্দের

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়,এর ফলে সামরিক বাহিনীরও অনেকযোগ্য নেতৃত্ব থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত হন। অবশ্য জেনারেল এরশাদ সামরিকখাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীন শৃংখলা সুসংহত করা ও পেশাগত দক্ষতা এবং মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সংগত কারনেই জেনারেল এরশাদের শাসন কালকে নিঃসন্দেহে সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল কতিপয় সম মনা রাজনীতিক সহায়তায় মূলতঃ একটা সামরিক বেসামরিক আমলা তান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু যখনই বিক্ষুব্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেনীর আন্দোলন হিংসাত্মক রুপ নেয় এবং সাহায্য দাতা দেশগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে সামরিক বাহনীও সমর্থন প্রত্যাহার করে,আমলারা রাজপথে বেরিয়ে আসে। তখনই জেনারেল এরশাদের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে। রেখে যায় সামাজিক বিশৃংখলা, রাজনৈতিক অবক্ষয়, বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও ঢিলেঢালা নড়বড়ে দুর্নীতি গ্রস্থ প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থা।

সবশেষে বলতেপারি যে, ১৯৯০ এর বিজয় দিবস হয়ে উঠে মুক্ত মানুষে মুখরিত। বিজয়ের এই আনন্দ, এর অন্তর্নিহিত চেতনা শক্তি, সংগ্রামী প্রেরনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জনতার দুর্বার সংগ্রামের মুখে সমূলে পতন হয়েছে স্বৈরাচারী এরশাদের। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যেমন এদেশের মানুষ একাবদ্ধ হয়েছে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনও সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। গুলি বর্ষনের মুখে,কারফিউ ও জরুরী আইন ভঙ্গ করে এবং স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয় অনেকেই। সংগ্রামী জনগন প্রমান করেছেন ক্ষমতার সকল উৎস জনগন, অস্ত্র নয়। শত শহীদের রক্তস্নাত গনঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গনতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহবায়ক প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ফয়েজ আহমেদ বলেন, ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গন-আন্দোলনের পথিকৃত ছাত্রঐক্য, রাজনৈতিকদল, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের গনতন্ত্রের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার ফলেই আমরা আজ এই ক্রান্তিলগ্নে এসে পোঁছেছি। এছাড়াও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল কৃষক, শ্রমিক, বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি সাধারন জনতা। এই আন্দোলনের বিজয়ের স্বাদ তাই সবারই প্রাপ্য। শুধু মাত্র বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল, কর্মী বা গোষ্ঠীর নয়। জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে আমরা যেন অতীতের ভুল আবার ও না করি এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারি। যে সংকল্প, সাহস, ও দৃঢ়তার ফলে আজ আমরা জয়ী হয়েছি সেই সাহস ও দৃঢ়তাকে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে হবে। ঐক্যবদ্ধ অপরাজেয় জনতার শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। ছাত্র, জনতা, রাজপথে রক্তঢেলে গনতন্ত্রের পথ সুগম করেছে। স্বৈরাচারের পতন ঘটেছে যে ঐক্যের ফলে একমাত্র সেই ঐক্য বজায় রেখেই এই অর্জিত বিজয় ও সাফল্যকে উত্তরোত্তর ইস্পিত লক্ষ্যে পোঁছে দেয়া সম্ভব।

(দীর্ঘ নয় বছরের সামরিক স্বৈরশাসনের অবসানের পর বাংলার মানুষ আবারও শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।বিচারপতি সাহবুদ্দিন তার তিন মাসের শাসনকালে ন্যায় পরায়নতা, নিরপেক্ষতা, সততা ও বিচক্ষনতার জন্য কিংবদন্তীর নায়কে পরিনত হন।) [হান্নান, ডিসেম্বর, ১৯৯৮;১৮৩]।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গন আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারী বিভিন্ন দলের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং এর শাসন ভাগ ন্যস্ত হয়েছিল মুসলিম লীগের উপর। মোহম্মদ আলী জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট হলেন এবং লিয়াকত আলী খান হলেন প্রধান মন্ত্রী। শেখ মুজিব তখনই বুঝতে পেরেছিলেন মুসলীম লীগের হাতে ক্ষমতা থাকলে পূর্ব বাংলার মানুষ নির্যাতন হবে। সেজন্য তখন থেকেই শেখ মুজিব ছাত্রদের সংগঠিত করতে শুরু করেন এবং বলেন মুসলীম লীগ জনগনের অর্থনৈতিক মুক্তি চায়না। এরা ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শেখ মুজিব ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগ ভর্তি হন। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। তরুন নেতা শেখ মুজিব ছিলেন এ আন্দোলনের পুরোভাগ। ভাষা আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন এবং ঘোষনা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দূ। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্যে ছাত্র সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠে এবং সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি প্রতিবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবকে জেলে যেতে হয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্টিত হয়।

(প্রথমে এই দলটির নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। পরে ব্যাপকালে "মুসলিম" শব্দটিকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ গঠন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন সভাপতি, শামসুলহক ছিলেন সাধারন সম্পাদক এবং শেখ মুজিব ছিলেন সহ-সম্পাদক। ১৯৫০ সালে মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও শামসুল হক।) [মিজান, ১৯৯০;২২]

১৯৪৯ সালের ৪জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্থান আওয়ামী। এ সংগঠন গুলোই পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে, ৫১ সালের ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস, ৫৩-র শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৫-র ৯২(ক) ধারা বিরোধী আন্দোলন, ৫৬-র খাদ্য সংকট নিরসনের আন্দোলন নেতৃত্ব দেয়। ১৯৫৮ সালে জারি করা হয় সামরিক শাসন। এই সামরিক শাসন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান সোপতি আইয়ুব খানের নেতৃত্বে ৪৪ মাস স্থায়ী ছিল।

১৯৬২ সালের আইয়ুব খান এক সংবিধান জারী করেন এবং তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব সহ সকল রাজনৈতিক নেতাকে বন্দী করা হয়। ৬২-র ২ জুন ৪ বছরের জন্য সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর বাস ভবনে আওয়ামী লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী উথ্যাপিত হয়। ১৯৬৫ সালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করে এক মামলা দায়ের করা হয় এবং এক বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়।

(১৯৬৬ সালে লাহোর অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বিরোধী দলের সভায় বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবী পেশ করা হয় যা ছিল বাঙ্গালী জাতির মুক্তির সনদ। বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের নির্বাচিত সভাপতি হয়ে ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃস্টির জন্য সারা বাংলায় গনসংযোগ সফর

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করেন এবং এই জন্য তাকে সে বৎসর ৩ মাসে ৮ বার গ্রেফতার করা হয়।) [মানিক, ১৯৯৮; ২০]

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারী পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামী করে মোট ৩৫জন বাঙ্গালী সেনা ও সিএসপি অফিসারদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি দিয়ে আবার জেল গেট থেকেই গ্রেফতার করা হয়। ফলে আসামীদের মুক্তির দাবীতে সারা দেশে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারী ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রিয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। পরে এই আন্দোলই গন আন্দোলনে পরিনত হয়। বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে যখন গনঅভ্যূথানে রুপ নিল ঠিক তখনই আইয়ুব সরকার মুজিব তা প্রত্যাখান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার জনগনের প্রচন্ড চাপের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য আসামীকে মুক্তি দান করে। এই উপলক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে (সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে) এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় এবং প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধীতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষনে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবীর প্রতি পূর্ন সমর্থন জানান এবং তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে রাওয়াল পিন্ডিতে যোগদান করেন। এই বৈঠকে তিনি আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবী উথ্যাপন করে বলেন, পূর্ব বাংলার গন-অসন্তোষ নিরসনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই।

১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারী। বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ৭ জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে জন সভায়

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামীলীগ কে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৫৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসন লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে জনপ্রতিনিধিদের শপথ পরিচালনা করেন। ২৮ জানুয়ারী জুলফিকার আলী ভূট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং এ আলোচনা ব্যর্থ হলে ১৩ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহবান করেন। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষনা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং ২ মার্চ দেশ ব্যাপি হরতাল পালনের আহবান করা হয়। ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন,"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হলে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য বাঙ্গালী সামরিক, বেসামরিক যোদ্ধা, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগনের প্রতি আহবান জানানো হয়। চট্রগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষনা প্রচার করা হয় এবং ২৬ মার্চ তাঁকে বন্দী করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মার্চ চট্রগ্রামে স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামীলীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর ঘোষনা পত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহের পুরের

Dhaka University Institutional Repository

বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিব নগরে) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয় এবং বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী। আন্তর্জাতীক চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধকে ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডনে পাঠানো হয় এবং লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে তিনি দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। ১২ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু প্রথমে রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহন এবং অল্প সময়ে মধ্যে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতি সংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধুর সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ ২৯৩টি আসন লাভ করেন। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও,আই,সি) সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলায় ভাষন দেন। এটাই ছিল জাতি সংঘে প্রথম বাংলা ভাষন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী। রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু রাষ্টপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য এবং আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক নীতিমালাকে ঢেলে সাজানো হয়। অতি সল্পসময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

চোরকারবারী বন্ধ হয়ে যায় ও দ্রব্য মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সে সুখ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ঠ ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বাংলাদেশর স্থপতি বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী অফিসার বিশ্বাস ঘাতকের হাতে নিহত হন- এটি বাঙ্গালী জাতির এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসাবে পরিচিত"।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চিড় ধরে এবং উগ্র-ভারত বিরোধী ভূমিকার কারনে দুই দেশের মধ্যে বৈরী ভাবের সৃষ্টি হয়। ১৯৭৬ সালের ৪ আগষ্ট এক সামরিক আদেশ বলে দেশে রাজনৈতিক দল গঠনের বিস্তারিত নীতিমালা ঘোষনা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে বহুদলীয় রাজনৈতিক দল গঠনের বিস্তারিত নীতিমালা ঘোষনা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে বহুদলীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ১৭ নভেম্বর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মৃত্যুতে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চির বিদায় ঘটে। ১৫ আগষ্ঠের পর খন্দকার মোশতাক দেশের প্রেসিডেন্ট হন, তিনি ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭৬ সালের ২১ নভেম্বর এক ঘোষনায় বলা হয়, প্রতিশ্রুত এই নির্বাচন আপাততঃ হচ্ছেনা। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান এক বেতার ভাষনে দেশে এক সাধারন নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করেন।

তিনি প্রেসিডেন্ট পদে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দিনই এক সামরিক আদেশ বলে দেশের সংবিধান থেকে চারটি মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিলুপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

ঘটান। এর তিনদিন পরই জিয়া তাঁর ১৯ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘোষনা করেন। (১৯৭৮ সালে ১ সেপ্টম্বর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করে এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালের ১৭ জুন, '৭৫ এর সেই একই গোষ্ঠী জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুথানের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।) [হান্নান, ১৯৯৮;১৫৮]

১৯৮১ সালের ৩১ মে আরেকটি সামরিক অভ্যূথানের চেষ্টা চালানো হয়। এই সময় জিয়া চট্রগ্রাম সফরে ছিলেন। মেজর জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করা হয় এবং সে রাতেই স্থানীয় সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। ১৫ নভেম্বর তড়িঘড়ি করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করা হয়। বিচারপতি এম,এ, সাত্তার বি,এন,পির প্রার্থী হন।

হাজার হাজার ব্যর্থতা, দুর্নীতি সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ইত্যাদি সংকটজনক অবস্থার ফলে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ,এম, এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে বসেন। এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের (বি,এন,পি) নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র গ্রহন করেন। জুলাই মাসে জামাতুল বিদার দিনে প্যালেস্টাইনে ইসরাইলি হামলার প্রতিবাদের নাম করে ঢাকায় ছাত্ররা সামরিক আইনের ভেতরই এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে, শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান প্রনীত শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে। '৮২ সালের ৮ নভেম্বর ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাসদ ছাত্রলীগের সমাবেশে পুলিশ হামলায় সাধারন ছাত্র ছাত্রীসহ শিক্ষকরাও আক্রান্ত হলে পরিস্থিতি গুরুতর রূপ নেয়। ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

সালের একুশে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে দেশে বড় ধরনের রাজনৈতিক মেরুকরন ঘটে এবং আওয়ামীলীগ, বাকশাল, জাসদ, বাসদ, কমিউনিস্টপার্টি, ন্যাপওয়াকার্স পার্টি, সমন্বয়ে ১৫ দলীয় এবং জাতীয়তাবাদী দল, ইউপিপি কমিউনিস্ট লীগ ও জাতীয় লীগ ইত্যাদীকে নিয়ে গড়ে উঠে ৭ দলীয় জোট।

১৯৮৩ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ১৫ দল এবং তার সমর্থক ছাত্র সংগঠনগুলো আসন্ন একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে গনমিছিলের ঢল নামানোর পরিকল্পনা করে। সেদিন নির্বাচারে গুলি করে ছাত্রদের হত্যা করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী জাফর ও ১৫ ফেব্রুয়ারী মোজ্জামেল নিহত হয় এছাড়া আহত হয় শত শত মানুষ এবং গ্রেফতার করা হয় অনেককে।

(১৯৮৩ সালের ২৮ নভেম্বর ছিল সচিবালয়ের সামনে ১৫ ও ৭ দলের যৌথ অবস্থান ধর্মঘট। সরকার শুরু থেকেই ১৪৪ ধারা জারী করে। ঐদিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হয় এবং এর প্রতিবাদে ৪৮ ঘন্টা লাগাতার হরতাল পালন করা হয়।) [হান্নান, ১৯৯৮;১৬৯]।

১৯৮৪ সালের গোড়া থেকেই এরশাদ বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসেবে উপজেলা নির্বাচন বিরোধী আন্দোলনে সূচনা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলের উপর কান্ডজ্ঞানহীন ভাবে পুলিশের ট্রাক তুলে দেয়া হয়। ট্রাকের নীচে পিস্ট হয়ে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ার মৃত্যু বরন করে। ১ মার্চ এর প্রতিবাদে হরতাল পালিত হয় এবং ঐদিন ছাত্রইউনিয়নের সাবেক নেতা তাজুল ইসলামকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পেশাদার সন্ত্রাসীর " ক্রস ফায়ারে' নিহত হন জাতীয় নেতা রাউফুন বসুনিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ৭ মে এরশাদ আমলের প্রথম সংসদ নির্বাচন হয়। এর ফলে নির্বাচন পন্থী ও নির্বাচন বিরোধী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। ৩০ মার্চ সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আসলাম নিহত হয়।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবিতা উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীরা দু'টো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। নভেম্বর মাসে এরশাদ হঠাও আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। ১০ নভেম্বর নুর হোসেন নামের একজন অসীম সাহসী যুবক 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' - এই শ্লোগান বুকে পিঠে লিখে মিছিল করেন। কিন্তু সেদিন পুলিশ তাকে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১১ নভেম্বর সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একতরফাভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এদিকে মিথ্যা খবর প্রচার ও শিল্পীদের কালো তালিকা ভূক্ত করার প্রতিবাদে শিল্পীরা টেলিভিশন অনুষ্ঠান দলে দলে বর্জন করতে শুরু করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসবে শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক মিনিট আগে স্বৈরাচারী এরশাদের একটি প্রতিকৃতি এঁকে 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' বলে তাতে অটোগ্রাফ দেন। ৩রা মার্চ পাতানো খেলার মতো সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আ.স.ম আব্দুর রবকে বিরোধী দলের নেতা বানানো হয়। ১১জুন বিরোধী দল এর বিরুদ্ধে হরতাল ডাকে।

১৯৯০ সালের শেষ দিক থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আরও ঘোরতর রূপ ধারণ করে। ১০ অক্টোবর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। জাতীয় পার্টির কর্মীরাও অস্ত্র নিয়ে পথ নেমে আসে এবং এদের গুলিতে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্র জাহিদ হোসেন মারা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ অক্টোবর তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র মনিরুজ্জামানকে মিছিলে গুলি করে হত্যা করা হয়। বস্তুতঃ এভাবেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মোড় পরিবর্তন করে। ২৭ অক্টোবর সারাদেশে রাজপথ, রেলপথ, পানিপথ, অবরোধের কর্মসূচী নেয়া হয়। এই কর্মসূচীর পক্ষে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। ৮ নভেম্বর ছাত্ররা রাষ্ট্রপতির সচিবালয় এবং ১৭ নভেম্বর মন্ত্রীদের বাড়ী ঘেরাও করার কর্মসূচী ঘোষনা করে। ২০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের যৌথ ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ২৩ নভেম্বর দীর্ঘদিনের সন্ত্রাসী বলে খ্যাত নীরু- অভি ছাত্রদল থেকে বহিস্কৃত হয় ও ২৫ নভেম্বর তারা শহরে নারকীয় হত্যাকান্ড শুরু করে। (২৭ নভেম্বর তারা ডঃ শামসুল আলম মিলনকে প্রকাশ্য দিবালোকে টিএসসি-এর- মোড়ে গুলি করে হত্যা করে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ঢাকা শহর গর্জে উঠে। সরকার ভয়ে সান্ধ্য আইন জারী করলেও ক্ষুব্ধ জনতা কারফিউ ভেঙ্গেই রাস্তায় নেমে আসে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেও টিকিয়ে রাখতে নেমে আসে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেও টিকিয়ে রাখতে পারেনি জনগণকে। ২৭ নভেম্বর থেকে এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। [হান্নান, ১৯৯৮; ১৭৮]

অবশেষে ৪ ডিসেম্বর '৯০ রাতে বাংলাদেশের মাটিতে দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৮২ সাল থেকে গেড়ে বসা স্বৈরাশাসনের অবসান ঘটে। তিনি পদত্যাগের ঘোষণা করেন ও ৫ ডিসেম্বর সাড়া দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উল্লাসে রাস্তায় নেমে আসে। ৬ ডিসেম্বর এরশাদ বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবউদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র জনতার পাশাপাশি সর্বস্তরের শিল্পী সমাজ ও তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত তথ্যানুসারে দেখা যাচ্ছে যে, বার বার ক্ষমতার হাত বদলে সামরিক সরকার স্বৈরাচারী এরশাদ ১৯৮২ সালে বি,এন,পি'র নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে বন্দুকের নলের মুখে গতিচ্যুত করতে বাধ্য করেন। যার করুন পরিণতিতে '৯০ এর গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। আমি মনে করি এই গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-শিক্ষক, চিকিৎসক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকলেরই পূর্ন অংশগ্রহণ ছিল। অবশ্য প্রথম থেকেই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী স্বাধীন বাংলার জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

সভা-সমিতি ও ক্লাব-সোসাইটি-এসোসিয়েশন হল এযুগের মানুষের সামাজিক জীবনের অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয়, অপরিহার্য সহচর। আদিম মানব সমাজেও ক্লাব, সোসাইটি ও এসোসিয়েশন ছিল। কোথাও বয়সভেদে, কোথাও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, এমনকি কোথাও কোথাও ষ্টেটাস বা মর্যাদা ভেদেও সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধীতাও ছিল। কোথাও কোথাও ছিল 'ব্যক্তি', 'পরিবার' ও 'ক্লাব' প্রত্যেকটির ইউনিটের সঙ্গে বিরোধ।

সভ্য-সমাজের সভা-সমিতির বৈশিষ্ট্য হলো তার গোষ্ঠী গত ও শ্রেনীগত স্বাতন্ত্র। এই জাতীয় সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তার প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে। নানা কারণে নানা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে এসব সমিতি বা সংগঠন গড়ে উঠে।

(১৮৩৮ সালে ঢাকায় প্রথম যে সমিতি স্থাপিত হয়। তার নাম ছিল 'তিমির নাশক সভা'। ৪৫ এর পর থেকে বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নানা ধরনের সংগঠনের জন্ম হয়। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে স্থাপিত মোট ৩৭৪টি সভা সমিতির খোঁজ পাওয়া যায়। এরমধ্যে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী ছিল মুসলমানদের সমিতি বা আঞ্জুমানগুলি। আর এসব সংগঠনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল আত্মোন্নায়ন, নেতিক উন্নয়ন, সমাজসেবা, শিক্ষা, সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ প্রভৃতি। এছাড়া কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সভা-সমিতিরও খোঁজ পাওয়া যায়।) [সিদ্দিকী, ১৯৯১;৩১]

সংগঠন গড়ে তোলার এই ধারা পূর্ববঙ্গে আরও লক্ষ্যমুখী ও উদ্দেশ্যপ্রবল হয়ে উঠে, হয়ে উঠে আরও বিচিত্রমুখী। এখানে আলোচ্যবিষয় সাংস্কৃতিক সংগঠন। সমাজ চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কখনও রাজনীতি বিছিন্ন নয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিবর্গ বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ফলে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গিও একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়েছে।

জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ তথা পরিশীলিত জীবনবোধ সৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় সংস্কৃতি নিয়ে যতই বিতর্ক করি না কেন, একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, পূর্ব বাংলার মানুষ উনিশ শতকের গোড়া থেকেই তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোড় দিয়েছে। তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

পূর্ব বাংলার মানুষ বরাবরই তুলনামূলক ভাবে শিক্ষাবঞ্চিত এবং দরিদ্র। নানা জিগিরে বিভিন্ন সময় তাদের দিয়ে নানারকম ফায়দা হাসিল করে নিয়েছে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দেশে জনসচেতনতা বেড়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট রূপদান করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষিত ও সৎ জনগোষ্ঠীর। সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার প্রয়াস ছিল, তার প্রধান ভিত্তি ছিল স্বাধীন সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও ইসলাম ধর্ম। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। তাতে মধ্যপন্থী ও বামপন্থী ধারার বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। সে সময় ক্ষীণ ধারায় অথচ বাংলার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের চেতনাও প্রবাহিত ছিল। এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখেই পুর্ববাংলায় ১৯৪৭-৭১ পর্বে যেসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল, সেগুলোর প্রধান প্রধান সংগঠনের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া এসব সংগঠনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন শিল্পী-সাহিত্যিক। সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে সেও কম বড় আন্দোলন নয়। একই সঙ্গে এদেশে যেসব সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েছিল তার প্রধান প্রধান সম্মেলন ও ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-৭১ পর্বে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক প্রবণতার উন্মোচন ঘটে।

আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পর থেকেই রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকায় নানা রকম সরকারি বিধি-নিষেধের মুখেও দেশজুড়ে সংস্কৃতিচর্চা ও অন্যান্য কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর বলতে গেলে প্রকাশ্যেই রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৭ সালের ২০জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সরকারী দলের নেতা সবুর খান পয়লা বৈশাখ পালন ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপনকে ইসলাম বিরোধী কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। ২২ জুন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবউদ্দীন রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রচর্চা নিষিদ্ধ করার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করেন। [হান্নান, ১৯৯;৮৪]

পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেনীর মওলানাও রবীন্দ্রচর্চা ও পয়লা বৈশাখ পালনের বিরোধীতা করে বিবৃতি দেন। তবে এর প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৯জন বুদ্ধিজীবী ২৮ জুন রবীন্দ্রনাথ ও পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে সরকারী প্রচারণার নিন্দা করে বিবৃতি দেন। রবীন্দ্র অনুসারী বিবৃতিদাতা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন বিজ্ঞানী ডঃ কুদরাত-ই-খুদা, কবি সুফিয়া কামাল, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, কবি শামসুর রহামন, হাসান হাফিজুর রহমান, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ। এ উপলক্ষে ডাকসু ও সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে। (প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ও ১লা বৈশাখ থেকে বাঙালী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। খুলনা, চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য জায়গাতে ও সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।) [হান্নান, ১৯৯৮;৮৫]

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পুর্ব পাকিস্তানে ঘটে যায় ইতিহাসের বৃহত্তম জলোচ্ছাস ও ঘূর্নিঝড়। ভোলা, হাতিয়া সন্দ্বীপসহ উপকূলীয় অঞ্চলের এইসব স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়। কিন্তু দুর্গতদের সেবায় ও যারা প্রাণে বাঁচে তাদের উদ্ধার কাজে পাকিস্তান সরকার চরম অবহেলা প্রদর্শন করে। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই পুর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

'৭০ এর ১৮ নভেম্বর তারিখে কবি-সাহিত্যিকসহ বাংলাদেশের শিল্পী সমাজ 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' শীর্ষক ব্যানার নিয়ে ঢাকার রাজপথে মৌন মিছিল বের করলে শোক বিহ্বল এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নির্বাচন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র ন্যাপ- নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান ছাড়া সেখানকার আর কোন নেতা সেদিন পূর্ব বাংলার দুর্গত মানুষদের দেখতেও আসেননি। (এ ঘটনা নিয়ে 'দৈনিক

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বদেশ' এই সময় 'ওরা কেউ আসেনি' শিরোনামে 'ব্যানার হেড লাইন'- এ সংবাদ ছাপলে পূর্ব পাকিস্তান বাসীর মনে চাপা ঘৃনা মিশ্রিত ক্ষোভের সঞ্চার হয়।) [হান্নান, ১৯৯৮;১০৭]। পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগে সেই সময় নতুন যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের এমন একজন কর্মকর্তা যিনি রেডিও মারফত ঝড়ের পূর্বাভাস ও বিপদ সংকেত প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, ফলে ঝড়ের প্রকোপ বুঝতে না পারার কারণে ঘুমের মধ্যেই লাখ লাখ উপকূলবাসী জলোচ্ছাসের তোড়ে ভেসে যায়। ঢলে পড়ে নির্মম মৃত্যুর কোলে। চরম অবহেলা ও ক্ষমাহীন দায়িত্বহীনতার প্রতিশোধ স্পৃহায় বাঙ্গালী জাতি সংঘটিত হয় এবং উদ্বেল হয়ে উঠে বাঙ্গালীর মুক্তি কামনায়।

অসহযোগ আন্দোলনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে এই সংগঠন অসাধ্যকে সাধন করে। সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেই সময়ে তারা নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল।

সকল প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রেসিডেন্টের উক্ত ঘোষণার পরপরই ঢাকার সকল সরকারী-বেসরকারী অফিস, আদালত, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, সিনেমাহল, যানবাহন, বাস-ট্রাক, স্কুটার এমনকি প্রাইভেট কার চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানী শহরের সকল রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। (রাতের ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। পরের দিনও লক্ষ্য করা যায় একই ধরণের ঘটনার পুনারাবৃত্তি) [রহমান, ১৯৯৮;৬৩]।

Dhaka University Institutional Repository

৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শোষকশ্রেনী ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল দায়ী। ৪ মার্চ ঢাকার ২৪ জন প্রখ্যাত শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগন ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত তারা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না। পূর্ব বাংলার ৩৩জন চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও সঙ্গীত পরিচালক একযুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সঙ্গে থাকবে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দান করেন আবদুল জব্বার খান, খান আতাউর রহমান, সালাউদ্দিন, ইফতেখারুল আলম, মোশাররফ, রোজী চৌধুরী, মুস্তাফিজ, আনোয়ার হোসেন, শবনম রাজ্জাক, রোজী সামাদ, কবরী আজিম, সুজাতা, আবুল খায়ের, সুলতানা জামান, কিউ,এম, জামান, ই,আর,খান, মোস্তফা, আব্দুস সামাদ, নারায়ন ঘোষ, সত্যসাহা, গাজী মাজহারুল ইসলাম, হায়দার আলী, সুবল দাস, রাজ, আখতার হোসেন, নূরুল হক বাচ্চু, আলতাফ মাহমুদ, সুচন্দা ও জহির রায়হান।

(৪ মার্চ ঢাকার ২৪ জন প্রখ্যাত শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগন ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন। ততদিন পর্যন্ত তারা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না।) [রহমান, ১৯৯৮;৬৪]

৫ মার্চ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীরা সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্দোলনে নিহত শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

জানাজা শেষে একটি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। ঐদিনই পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী কলেজ শিক্ষক-সমিতি এক বিবৃতিতে জানায় যে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

৬ মার্চ বেতার, টিভি ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক সভায় বর্তমান স্বাধীকার আন্দোলনের মূল কথাকে গানের সুরে জনতার মুখে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বাংলা একাডেমী চত্ত্বরে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু। গণ আন্দোলনকে সঠিক ভাবে চিত্রিত করার জন্য বিশ্বের সকল সাংবাদিকদের প্রতিও আহ্বান জানান।

৭ মার্চ এক পর্যায়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। রমনা রেসকোর্স থেকে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা রিলে না করার প্রতিবাদে এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আওয়ামীলীগের খবর যথাসময়ে পরিবেশন করতে না দিলে বেতার বর্জন করার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বেতারের সকল বাঙালী কর্মচারী বেড়িয়ে এলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। মিরপুর ও সাভারস্থ বেতারের প্রায় ৫'শ কর্মচারী কাজ বন্ধ রেখে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

৮ মার্চ শিল্পীদের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গণআন্দোলনের সঙ্গে প্রতিবারের মত এবারও বাংলার সমগ্র শিল্পী সমাজ একাত্ম রয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন।

৯ মার্চ ইপি ওয়াপদা ওয়াকার্স ফেডারেশনের ১৬জন নেতা যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশ স্বাধীকার আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এক মরণজয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফেডারেশনের সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

১০ মার্চ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী বাংলার মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলার সকল স্তরের লোকের কাছ থেকে গণমুখী সঙ্গীত রচনা করার জন্য আহ্বান জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিল্পীদেরকে স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। (স্বাধীকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মুর্তোজা বশীর তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, "মুক্তি ও স্বাধীকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগন- যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে আমি সচেতন শিল্পী হিসেবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।) [রহমান, ১৯৯৮;৬৬]।

১২ মার্চ চারু ও কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী সৈয়দ সফিকুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিল্পীরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, সভা অনুষ্ঠানে সাইক্লোষ্টাইল করে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা, আন্দোলন মুখী পোষ্টার-ফেষ্টুনসহ মিছিলের আয়োজন করা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

১৩ মার্চ ঢাকা শহরের ষ্টেট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক, ইষ্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ও ইন্ডাষ্টিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিদের এক জরুরী বৈঠকে যেসব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও প্রধান প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রিয় পরিচালক বোর্ড) পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত, অবিলম্বে সেইসব ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা প্রদান করে স্বাধীনভাবে কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়তা আদেশ দেয়ার জন্যে বঙ্গবন্ধুর কাছে দাবী জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ মার্চ নারায়নগঞ্জ এডভোকেট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান বঙ্গবন্ধুর ৪ দফা দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই ৪ দফা দাবী মেনে নেয়ার মাধ্যমেই কেবলদেশের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা পেতে পারে। কৃষি গ্রাজুয়েট, কৃষি ডিপ্লোমা হোল্ডার ও কৃষি কর্মচারীদের এক যৌথ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন ও অবিলম্বে তার ৪ দফা দাবী মেনে নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানানো হয়।

১৫ মার্চ টেলিভিশন নাট্য শিল্পীরা আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে এক সভায় বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, গনআন্দোলনের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করা হবে না। সভায় বক্তব্য রাখেন ফরিদ আলী, হাসান ইমাম, শওকত আকবর, আলতাফ হোসেন, আবুল সাদাৎ হাসমী (শামিম), আনোয়ার কাজী মাকসুদুল হক, রওশন জামিল ও আলেয়া ফেরদৌস। ঐদিনই বাংলাদেশের চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ৪ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক চিকিৎসককে নিজ নিজ এলাকায় স্ব-স্ব উদ্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জনসাধারণকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। (সভায় বক্তৃতা করেন ডাঃ মান্নান, ডাঃ এস.এম.রব, ডাঃ আশফাকুর রহমান, ডাঃ টি,আলী, ডাঃ সারোয়ার আলী, ডাঃ নাজমুন নাহার, ডাঃ গাজী আব্দুল হক এবং ডাঃ মোদাসসের আলী।) [রহমান, ১৯৯৮;৬৭-৬৮]।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবীগণ এক সভায় অভিমত প্রকাশ করেন যে, সামরিক আইন তুলে নিয়ে পরিষদের অধিবেশনের আগেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আইনগত কোন বাধাই নেই। সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষনায় অন্তর্ভূক্ত ৪ দফা দাবী অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঐদিনই মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনের সভায় মালেকা বেগম বেলন, "শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে"।

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আহূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউক্রমে ক্রমে শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সভা-সমিতি, আর শ্লোগানে-শ্লোগানে গ্রামবাংলা মুখরিত হতে থাকে। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে সদরঘাট টার্মিনাল, হাজারীবাগ, মগবাজার ও শান্তিনগর এলাকায় গণসঙ্গীত, গণনাট্য অনুষ্ঠান ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ মার্চ শহীদ মিনারের পাদদেশে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যরা স্বাধীকার আন্দোলনে মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তারা সভায় ঘোষণা করেন যে, বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও স্বাধীকার আন্দোলন সফল করে তুলবেন।

১৯ মার্চ ৪১জন আইনজীবী একযুক্ত বিবৃতিতে পরবর্তী ২৩মার্চ 'শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার জন্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান। আইনজীবীগন বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যতিত কোন পথ খোলা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২১ মার্চ ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সমিতি এক সভায় বাংলাদেশের স্বাধীকার আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধুর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন। ঐদিনই নোয়াখালী সিভিল বারের সদস্যবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে দেশকে সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর পেশকৃত ৪-দফা মেনে নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

২২ মার্চ বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সার্বিক স্বাধিকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। সভায় লে. কর্নেল (অবঃ) আতাউল গণি ওসমানী বক্তৃতাকালে বলেন, বাঙালী সৈনিক ১৬৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে শৌর্যবীর্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। তিনি প্রতি মহল্লায় মহল্লায় এবং গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তাদেরকে পাকড়াও করার পরামর্শ দেন। বাংলা বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মিছিল, সভা, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐদিনই জাতীয় লীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলা দিবস উপলক্ষ্যে শেরে বাংলার মাজার জেয়ারত, দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ সন্ধ্যায় বাহাদুর শাহ্‌পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ পল্টন ময়দানে ছড়া পাঠের আসর, গণসঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

(২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে স্থানীয় জে.এম. সেন হলে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে ভাষণদান কালে পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ঘোষনা করেন, "আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি, এই সংগ্রাম আমরা

Dhaka University Institutional Repository

চালাবো এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।" [রহমান, ১৯৯৮;৭০]

২৪ মার্চ ষ্টেট ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ শহীদ মিনারে স্বাধীকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থনদানের শপথ গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য ইন্সপেক্টরেট সমিতি এবং এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভায় বঙ্গবন্ধু আহূত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পুর্ন সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে। ভোলা ট্যাঙ্ক রোডস্থ পুর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর দপ্তরে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং গার্ড অব অনারও অভিবাদন করে পতাকাকে। ছাত্র-জনতা, স্বেচ্ছাসেবকদল বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। বিভিন্ন সংস্থা ও দলের উদ্যোগে মার্চপাষ্ট ও গনজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের যে দিকটি সবার চোখে ধরা পড়ে তাহলো বাঙ্গালী নিরস্ত্র হতে পারে কিন্তু তাদের বুকে রয়েছে অসীম বল। তাই তারা হাতের কাছে যা পেয়েছে, স্বাধীকার অর্জনের সংগ্রামের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী শক্তিকে প্রতিরোধ করার হাতিয়ার হিসেবে তাই তুলে নিয়েছে। যার ফলে স্বাধীকার অর্জনের দুর্জয় বাসনায় বলীয়ান হয়ে তাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে সামনের দিকে। সার্থক হয়েছে তাদের উচ্চারিত ধ্বনি- "আমরা স্বাধীকার চাই"।

১৯৮৬ সালের ৩০ নভেম্বর এরশাদ সরকার শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাজনীতি মুখর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কবিতা উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, ও সংস্কৃতি কর্মীরা সৃষ্ট দুটো দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এরশাদ সমর্থক একদল কবি সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে 'এশিয় কবিতা উৎসব'- এর আয়োজন করেন। অন্যদিকে কবি শামসুর রহমানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের অন্যান্য কবিরা আয়োজন করেন 'জাতীয় কবিতা উৎসব'। ১ ফেব্রুয়ারী 'শৃংখলা মুক্তির জন্যে কবিতা' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন কবি সুফিয়া কামাল। [হান্নান, ১৯৯৮;১৭২]

১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একতরফাভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এর ফলে একপেশে ও একতরফা মিথ্যা খবর প্রচার এবং শিল্পীদের কালো তালিকাভূক্ত করার প্রতিবাদে শিল্পীরা দলে দলে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বর্জন করতে শুরু করেন। ১ ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয় জাতীয় কবিতা উৎসবে শিল্পী কামরুল হাসান তাঁর মৃত্যুর মাত্র ১ মিনিট আগে স্বৈরাচারী এরশাদের একটি প্রতিকৃতি এঁকে 'দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে' বলে তাতে অটোগ্রাফ দেন। সেই থেকে এরশাদ 'বিশ্ববেহায়া' নামে অভিহিত হন।

১৯৯০ সালের শেষের দিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নতুন প্রানাবেগের সঞ্চার করে। ১০ অক্টোবর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে। ১৩ অক্টোবর তেজগাঁও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র মনিরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ ও ১৩ অক্টোবরের এই ঘটনার কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় খন্ড খন্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। এভাবেই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এমন এক সময় ছিল যখন মেয়েরা পর্দার বাইরে বের হতে পারতো না, আবদ্ধ থাকতে হতো অন্তঃপুরে। এমনকি স্কুল-কলেজে যাওয়াও নিষেধ ছিল। স্বাধীনতার আগেও মেয়েরা বোরখা ছাড়া বাইরে বের হতে পারতো না। কলেজে যেতে হলে বোরখা পরে যেতে হতো। রাস্তাঘাটে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেয়েরা বের হতো না। বাজার-ঘাট করার তো প্রশ্নই উঠে না। সামাজিকভাবে এটাই যেন ছিল নিয়ম। (তখন মনে করা হতো আপদমস্তক বোরখায় আবৃত ছাড়া কোন নারীকে দেখা গেলে তা মহা অন্যায়, না-জায়েজ কাজ, এজন্য তাদের সামাজিকভাবে একঘরে কিংবা বহিস্কৃত হবার সম্ভবনাও ছিল। এখন আর এসব নেই। মেয়েরা বা নারীরা ঐ সমস্ত রক্ষনশীল বাধাবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে আজ রাজপথে। [চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৫১]

১৯৭১ এর মহান বিজয়ের পর থেকেই সামাজিক জীবনে এই গুনগত পরিবর্তনের ধারা বিকশিত হতে শুরু করে। তবু সময় যথেষ্ট লেগেছে আজকের পর্যায়ে পৌছতে। এখন আর ধর্মীয় রক্ষণশীলদের মেরুদন্ড আগের মতো নেই। তবে রক্ষণশীলতা যেটুকু আছে তা অনেকটা ফ্যাশন মাত্র। বর্তমানে মেয়েরা তাদের স্বাধীন জীবন-যাপনে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন। অফিস, আদালত, কল-কারখানায় তারা পুরুষের সমপর্যায়ে কাজ করছেন। এমনকি ক্ষেতে-খামারেও এই দৃশ্যটি বর্তমান। স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েরা একইসাথে ক্লাশ করছে, বেড়াচ্ছে, রাজপথে আন্দোলন করছে, মিছিল করছে। নারী সমাজের অধিকার আজ আর ঘরের আঙ্গিনায় আবদ্ধ নেই, তা আজ সর্বত্র বিস্তৃত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী মুসলিম সমাজে রক্ষণশীলতার শৃংখল অত্যন্ত শক্তিশালী থাকায় মুসলিম নারীদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভূমিকা একেবারেই দূর্বল ছিল। মহান স্বাধীনতার পর থেকে অবশ্য এই দূর্বলতা ধীরে ধীরে কেটে যায়। মেয়েরা রাস্তাঘাটে বা অফিস-আদালতে তেমন অংশগ্রহণ না করলেও স্বাধীনতাত্তোর কলেজ অঙ্গনগুলো থেকে তারা

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন হতে থাকে। কলেজে এসেই নারী-পুরুষ একসাথে মেলামেশা থেকে শুরু করে সামাজিক অন্ধকারকে মুক্ত করার এক দৃঢ় প্রত্যয় খুঁজে পায়। সচেতনতা তাদেরকে সকল দুর্গমতা ছিন্ন করতে অপরাজেয় শক্তি এনে দেয় কিন্তু তবুও পারিবারিক রক্ষণশীলতা এর প্রচন্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে রাজনীতি চর্চাকে পরিবারগুলো একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এই মানসিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটায় সাংস্কৃতিক অঙ্গন। পরিবারগুলো রাজনীতি চর্চা পছন্দ না করলেও সাংস্কৃতিক চর্চাকে শেষ পর্যন্ত অবহেলা করতে পারে না। ফলে সাংস্কৃতিক দুয়ার দিয়েই নারী সমাজে বিশেষকরে মেয়েদের অগ্রযাত্রাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

বেশকিছু সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের শিল্পীরা সাংগঠনিক পর্যায়ে না হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক অনুষ্ঠান করেছে। এক পর্যায়ে 'ব্যক্তিগত' থেকে মিলিত পর্যায়ে বা 'সম্মিলিত' শিল্পীদের অনুষ্ঠানের ধারা চালু হয়। সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম বিষয় হলো সঙ্গীত। সঙ্গীতের মধ্যে সাধারনত: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, পল্লীগীতি ইত্যাদি ছিল প্রধান। তখন অন্যান্য গানের প্রভাব তেমন পড়েনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথেই তখন নৃত্য চর্চা চলতো। এসব কর্মকান্ডে মেয়েদের আগমন ছিল সর্বাধিক। পরবর্তীতে রবীন্দ্র, নজরুল, পল্লীগীতির পাশাপাশি গণসঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করে। সঙ্গীতের পাশাপাশি নাটক, নৃত্য ইত্যাদিতেও জোয়ার আসতে থাকে। বিপুল পরিমাণ সচেতন মেয়েরা এই অঙ্গনের সামিল হয়। যা নারী অগ্রগতিতে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। অতঃপর ব্যক্তিভিত্তিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার জোয়াল ভেঙ্গে গড়ে উঠলো অনেকগুলো প্রগতিশীল গণমুখী নাট্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন হলো কবিকণ্ঠ, উদীচী শিল্পগোষ্ঠী, গণশিল্পী সংস্থা, আবৃত্তি সংসদ ইত্যাদি। ১৯৯০ সালের মধ্যে এসমস্ত সংগঠন গুলোর মাঝে মেয়েদের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোতে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অংকনসহ যাবতীয় কাজের প্রধান ভূমিকায় মেয়েরা রয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনই ভেঙ্গে দিল সকল রক্ষনশীলতার দেয়াল। নারীদের নিষিদ্ধ সব অন্ধকার পথগুলো আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে পড়ে। কিভাবে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নারী সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে এসেছে তার আলোকপাত নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে করা হলো -

কবিকণ্ঠ ঃ ১৯৮০ সালেরও কিছু আগের দিকে এই সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। কবিতা চর্চার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কবিকণ্ঠের জন্ম। প্রথমদিকে মেয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু পরবর্তীতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও মঞ্চে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা উপস্থাপনের ক্ষেত্র তৈরী করে।

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ঃ ১৯৮০ সালের দিকে এই সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই শিল্পী গোষ্ঠী হাঁটিহাঁটি পা-পা করে শেষ পর্যন্ত এক বিরাট সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। ছেলে-মেয়েরা নির্বিশেষে উজ্জীবনী গান, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক এদের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এ সমস্ত অনুষ্ঠান এর শুরু শুধু মঞ্চেই নয়, উন্মুক্ত শহীদ মিনারেও মঞ্চস্থ করেছে। তাছাড়া বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা ছুটে গেছে দূর দূরান্তে, গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে।

গণশিল্পী সংস্থাঃ উদীচীর পরপরই গড়ে উঠে গণশিল্পী সংস্থা। এদের সিংহভাগই রয়েছে মেয়েরা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অশুভ দিকের সমালোচনা এবং মুক্তির পথ নির্দেশ সম্বলিত এদের গণসঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও পথনাটক সমাজে আরেক বিপ্লব সাধন করেছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস, সাংগঠনিক উৎসব সহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে এরা নেমে এসেছে খোলা রাজপথে। মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে ভরে তুলেছে সামাজিক পরিবেশকে। মেয়েদের

অংশগ্রহনের ফলে সমাজের রক্ষনশীলতাকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান।

আবৃত্তি সংসদঃ ১৯৮৬ সালের দিকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। প্রথম দিকে এই সংগঠনে মেয়ে ছিল না বললেই চলে। পরবর্তীতে দেখা যায় এর অধিকাংশই মেয়ে। এরাও তাদের মাধ্যমকে নিয়ে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে অবস্থানগত অগ্রগতিতে এক অবিস্মরনীয় ভূমিকা রেখেছে।

থিয়েটার-৭৭ঃ নাট্যঙ্গনে ও এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিষ্ঠানটি ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ক্ষেত্র গড়ে তোলার বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

যান্ত্রিকঃ নাট্য সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির সাহসী ভূমিকা অনুপ্রেরণা মেয়েদের সংঘবদ্ধ করতে এবং সমাজের রক্ষণশীলতা ভেঙ্গে দিয়ে নেমে এসেছে খোলা রাজপথে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও এই নাট্য সংগঠনে হরোদমে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুশীলন - আশি ঃ নাট্যাঙ্গনে এই প্রতিষ্ঠানটি নারীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে সাফল্য লাভ করেছে। এদের সাহসী নাটক মানুষের চেতনায় যেমন নাড়া দিয়েছে, তেমনি নারীদের নাট্যাঙ্গনে অংশগ্রহণের দ্বিধাকে দূর করেছে। যা বর্তমানে খুব প্রশংসনীয়।

ড্রামা সার্কেলঃ প্রথমদিকে এই সংগঠন মেয়েদের তেমন ভূমিকা না থাকলেও পরবর্তীতে বহু সংখ্যক মেয়ে এতে অংশগ্রহণ করে। ছেলে-মেয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সংগঠনটি আজ অনেক উপরে উঠে এসেছে।

গণমঞ্চঃ এই নাট্যগোষ্ঠীতে প্রথমদিকে মেয়েরা তেমন অংশগ্রহণ করেনি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি এই সংগঠনটিও

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে তোলে। [চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৫৩]

বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক পরিবেশে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড স্বাধীনতার পর থেকে অনেকবার ঝিমিয়ে পড়েছে। আবার রাজনৈতিক স্থবিরতাও অনেকসময় সাংস্কৃতিক চর্চাকে বন্ধাত্বের আবরনে আবদ্ধ করেছে। আর সেই মূহুর্তেই ঝড়ের বেগে নেমে এসেছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা যা সাংস্কৃতিক, মানসিকতার উপর বিষাক্ত ছোবলের মতো আঘাত হেনেছে। আর এই আঘাতের প্রধানতম শিকার হয়েছে নারী অগ্রগতির পথ। কাজেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই সংস্কৃতি চর্চাকে বিকশিত করার মধ্য দিয়েই আমাদের নারী সমাজের একটি গুনগত পরিবর্তনের ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে। এই ক্ষেত্রই একদিন সমাজের সকল অগণতান্ত্রিক পরিবেশ আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়রোধ সর্বোপরি মানুষকে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার সংরক্ষণে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(ভূ-লুণ্ঠিত গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, হত্যা, অত্যচার, নিপীড়ন, শোষন বঞ্চনার অবসান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও লুটেরা বাহিনীর হাত থেকে দেশের জনগণ মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ রক্তঝরা সংগ্রামের পথ বেয়ে সাম্প্রতিক যে দুর্জয় গণআন্দোলন গড়ে তোলে এবং তারই প্রতিরোধের মুখে ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পতন হয় এরশাদ সরকারের প্রায় এক দশক ('৮২-'৯০)- এর দুঃশাসন।) [রফিক, ১৯৯০;৫৯]

ছাত্র জনতার দুর্ভেদ্য আন্দোলনকে স্বৈরাশাসক এরশাদ রুখতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের রাজপথ রঞ্জিত করেছে ছাত্র-জনতা, ডাক্তার, রাজনৈতিক কর্মীর বুকের তাজা রক্ত ঝড়িয়ে। তাতেও ক্ষমতার মসনদ রক্ষা পায়নি। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো শিল্প ও বন্দর নগরী খুলনায় এই গণআন্দোলন দুর্জয় আকার ধারন

Dhaka University Institutional Repository

করে। আর এ আন্দোলনের পুরোধা ছিল খুলনার ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সমাজ। ছাত্র সমাজ এক মঞ্চে এসে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য পরিষদ নামে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। এরই সাথে গনতন্ত্রের সংগ্রামে লড়াইরত ৭ দল, ৮ দল, ৫ দল, জামায়াত, মুসলিম লীগ, ইউ,সি,বি,এল, মুক্তিপার্টি, যুব সংগ্রাম পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বিএমএ এবং খুলনার সচেতন কর্মজীবি সাংবাদিক সমাজ। আইনজীবী, শিক্ষাবিদরাও এগিয়ে এসেছে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে।

রাজনৈতিক শ্রোতধারা ক্রমশঃ কোন দিকে মোড় নেয় তা নির্নয় করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। তথাপি অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় '৯০ এর এ আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনের চেয়ে ভিন্নতর শ্রোতধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। ছাত্রঐক্য মূলতঃ তারুণ্য, শক্তি, প্রগতি ও চেতনার ঐক্যেরই নামান্তর। এ সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থেকেছে ৩১৪ দিন। যা পূর্ণ এক বছরের কার্যদিবসের চেয়েও বেশি। যা একলাখ ছাত্রের কাছে এক লাখ বছরের সমান। এভাবে এইদিনগুলো নষ্ট করার অধিকার কোন সরকারের থাকতে পারে না। আবারও যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় তখন ছাত্ররা অবস্থান নেয় সারা শহর এবং বিভিন্ন জেলা শহরে। (চট্টগ্রাম পলিটেকনিক- এ আন্দোলন, বাগেরহাটে ক্লাশ বর্জন, বরিশালে ছাত্র জমায়েত, সিলেটে সমাবেশ এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আন্দোলনের জোয়ার- আন্দোলন বিস্তৃতির প্রমাণ বহন করে।) [নন্দিতা,১৯৯০;১৯]

'৯০ এর নভেম্বরের প্রথমদিকে যথাক্রমে আদমজীতে ছাত্র-শ্রমিক জমায়েত ও সকল জেলা পরিষদের মধ্যে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে আন্দোলন প্রসার করতে সহায়ক হন। ছাত্রঐক্য ছাড়াও ৩ জোট নেয় অসংখ্য পদক্ষেপ। ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক, ভিসি, প্রত্যন্ত অঞ্চলের সচেতন সকলেই একই প্লাটফর্মে একত্রিত হওয়ায় এ আন্দোলন দ্রুত সাফল্যের দিকে মোড় নেয়।

ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে 'মন্ত্রী ও দালাল ঘেরাও' কর্মসূচী পালিত হয়। (বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রী ও এমপিদের বাড়ী ঘেরাও করা হয় এবং সেখানে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। রাষ্ট্রপতির এনজিও বিষয়ক উপদেষ্টা মাইকেল সুশীল অধিকারীর বাড়ী এবং খুলনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জহুরুল হক সরদার এমপি'র বাড়ীতে বোমা ও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়)। [চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৯]

এছাড়াও একদল যুবক খুলনা আঞ্চলিক তথ্য অফিসে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে এবং স্থানীয় দুর্নীতি দমন বিভাগ-অফিসে হামলা চালিয়ে সাইনবোর্ড ভাংচুর করে। নগরীর জাতীয় পার্টির কয়েকজন নেতার বাসভবনসহ গুরুত্বপুর্ন স্থানসমূহে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের উদ্যোগে শহরে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী নুরুন্নবী চাঁদ, রাজশাহী সিটিকর্পোরেশনের মেয়র মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ বাবুল ও একজন জাতীয় পার্টির এমপির বাসভবনে অবরোধ চলাকালে পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে ৩জন পুলিশসহ অর্ধ শতাধিক ছাত্র আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ও ৫০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠিচার্জ ও পরে টিয়ার গ্যাস এবং গুলি চালায়। এভাবে গণআন্দোলন আস্তে আস্তে গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আমি মনে করি সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা আলোচনা করতে হলে অবশ্যই পুর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পাকিস্তান আমলে বিশেষ করে ষাটের দশকে যে দূর্বলতার সূচনা হয়, তার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশেও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে বর্তমান সময়ে এখানে এক ধরণের সাংস্কৃতিক বিশৃংখলা ও বিপর্যয় লক্ষ্যণীয়। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ১৯৪৭-৭১ পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নতুন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফলে মানুষের আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্খাও বৃদ্ধি পায়। ডান-বাম নির্বিশেষে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে পরিপুষ্ট করতে চেয়েছিল। বিভিন্ন ধারা ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সচেতনতাই শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলের জনসাধারণকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বতন্ত্র জাতিসত্তার রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

(নানা দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি এখনও বহুলাংশে পাকিস্তান আমলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ধারা ধরেই বিকশিত হচ্ছে। বিরোধের ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এই ধারার অবসান ও উন্নততর নতুন ধারার প্রবর্তন সম্ভবপর হতে পারে- মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, ন্যায়কামী, বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন ভাবধারার ও কর্মধারার বিকাশ সম্ভবনা লক্ষ্য করা যায়।) [রহমান,১৯৮০;৩৮২।]

পাকিস্তান পত্তনের পরে প্রথমদিকে সর্বাধিক সক্রিয় ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান তমদুন মজালিকা। 'পাকিস্তানের তৌহিদী জনতার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান' পরিচয়ে এটি গঠিত হয় ১৯৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সালের ১ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম (জ-১৯২০) ছিলেন এর মূল সংগঠক। মজলিশের গঠনতন্ত্রে চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়- (ক) কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা' দুর করে সুস্থও সুন্দর তমস্থন গড়ে তোলা, (খ) 'যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেয়া, (গ) মানবীয় মূল্যবোধের ওপর সাহিত্যও শিল্পের মারফত নুতন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা এবং (ঘ) নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা। মজলিশে সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বিতর্কসভা ও আলোচনা অনুষ্ঠান রীতিমত হত। 'সাপ্তাহিক সৈনিক' প্রকাশিত হত রীতিমত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে মজলিশের ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'সংস্কৃতি সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে। প্রথমদিকে নাটক মঞ্চায়নের মধ্যে এর তৎপরতা সীমিত ছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' (১৯৫১ সালে), 'তুলসী লাহিড়ীর পেথিক' (১৯৫৩ সালে) ও বনফুলের 'কবর' (১৯৫৪ সালে) ছিল প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যভিনয়। এগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনা। ক্রমশঃ দেশাত্ববোধক গান ও গণসঙ্গীতের অনুষ্ঠান এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়।

(পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। সেখানে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার সুপারিশ করলে মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধীতায় সেটা বাতিল হয়। এই সংবাদে ঢাকার ছাত্ররা রাজনীতিবিদ-শিক্ষিত মহলে দারুন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠন মিলিতভাবে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে।) [রহমান; ১৯৮০;২৩]।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ২৬মে জানুয়ারী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঢাকা আগমন করেন। সেদিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় 'রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদের' আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং পরবর্তীতে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন ২১ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভীতসন্ত্রস্ত সরকার ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী একমাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারী করে, তাতে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়।

পূর্ব বাংলায় প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সরকারী উদ্যোগে। পরবর্তীকালে আরো চারটি সম্মেলন হয় বেসরকারী পর্যায়ে। সেগুলোতে কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা মতাদর্শের ভিত্তিক মিলিত হয়ে সাহিত্যের সমস্যাকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারায় সেগুলোর ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ-বিভাগের পর চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা পর পর দুটো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন- সংস্কৃতি পরিষদ ও প্রান্তিক। এ দুটো মিলিত হয়ে ১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কবিগানের আয়োজন সম্মেলনকে সফল করে তুলেছিল। 'দু'দিনের এই সম্মেলনে এত অভূতপূর্ব লোক সমাগম হয়েছিল যে পাশের সড়কেও তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয় পুর্ব বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রবাহমানতার ওপর। তারা নিজেদেরকে প্রাচীন বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও আধুনিক রবীন্দ্র, নজরুল সাহিত্যের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন।

কুমিল্লা প্রগতি মজলিশ এর উদ্‌যোগে- ১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪- এ আগষ্ট কুমিল্লায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ, কম্যুনিস্ট পার্টী ও রেভোলিউশনারী সোসালিস্ট পার্টির ন্যায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শাখাসমূহ এতে সহযোগিতা করে। সম্মেলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছিল সাহিত্য আলোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চিত্র প্রদর্শনী ও পুঁথি প্রদর্শনী। (কুমিল্লা সম্মেলন এদেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এর মূল আবেদন ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী পূর্ব বাংলার প্রবাহমান ঐতিহ্যে আস্থা রেখে, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, অসাম্প্রদায়িক, মানবমুখী ও গণমুখী দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করা দরকার- সম্মেলন এই মনোভাবকে পুষ্ট করেছে।) [রহমান, ১৯৮০;২৮]।

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে রাজনীতিতে মুসলিম লীগ বিরোধী নির্বাচনী যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে এদেশের সংস্কৃতি সেবীরাও ঐক্যবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগী হন। এর প্রধান ভূমিকা ছিল পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এর। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

এই সম্মেলনের মূল বক্তব্য পাওয়া যায় ১০৮জন শিল্পী সাহিতিক্যদের যুক্ত আবেদনপত্রে। তারা ছিলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ব বাংলার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপকতম ঐক্যকে তারা তাদের কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের অন্য ভাষার সাহিত্যের বিকাশের কথাও তারা বলেছিলেন। জাতীয় প্রগতি, বিশ্বশান্তি ও দেশ মানবের হিতার্থে সৃষ্টি ক্ষমতাকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োজিত করা, বাংলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যকে প্রবাহমান ধারায় নিয়ে যাওয়া, সকল রকম বিকৃতি, কুসংস্কার কূপ-মন্ডুকতা এবং জাতি-ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়গত সকল প্রকার বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে সাহিত্যের উপজীব্য করা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায্য আসনের জন্য চেষ্টা করা।

টাঙ্গাইলের কাগমারীতে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ছিল প্রধান। কাগমারী সম্মেলন বলা হয়- সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবতী করতে হলে শহরের বিদগ্ধ সংস্কৃতি ও মুলঐতিহ্য সম্পৃক্ত প্রানবান অমার্জিত পল্লী সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা দরকার এবং এই ধারণা সমস্ত কাজকর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎসব শুরু হয়। পূর্ব বাংলায় তখন ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। সামরিক সরকারের প্রকাশ্যে বিরোধীতা না থাকলেও নানা অজুহাতে আলাউদ্দীন আল আজাদ, কে.জি মোস্তফা, আনোয়ার, জাহিদ প্রমূখ সংস্কৃতিসেবীদের গ্রেফতার করা হয়। ফলে সংস্কৃতি অঙ্গনে বিরাজ করছিল থমথমে অবস্থা। বগুড়া, ফরিদপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসকদের নাম থাকায় ধীরে ধীরে সংস্কৃতি সেবীদের অস্বস্তি ও ভীতির ভাব কেটে যায়।

তারপর থেকে প্রদেশব্যাপী সেমিনার, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং বহুদিনের জড়তা ও নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রবল প্রানস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্‌যোগে ১১ই বৈশাখ কার্জন হলে প্রধান অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এতে সভাপতি ছিল বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে সকল রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে অবস্থিত মহান কবি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। গীতিনক্‌শা, আবৃত্তি ও সংগীত অনুষ্ঠানের মাধমে সভা সমাপ্ত হয়। ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুন শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক শিক্ষার্থীদের সমবায়ে 'রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উৎসব কমিটি' গঠিত হয়েছিল। সিম্পোজিয়াম, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে।

সরকারী ঘোষণার প্রতিবাদ ছিল সর্বজনীন ও সোচ্চার। প্রথম বিবৃতি দেন ১৯জন বুদ্ধিজীবী। তাঁরা সরকারের সিদ্ধান্তকে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করে বলেন: রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের কাছে সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রান্তি, ছায়ানট, সৃজনী, অপুর্বসংসদ, ঐকতান, সংস্কৃতি সংসদ, স্পন্দন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, আমরা ক'জনা, বাংলাভাষা সংগ্রাম পরিষদ,বানীচক্র, পুরবী ও খুলনার চৌদ্দটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ করে এবং রবীন্দ্র সাহিত্যকে বাঙালীদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে দাবী করে।

ষাটের কাল থেকে শুরু হয় বাঙালী চেতনায় সংরক্ষন ও আত্ম-আবিস্কারের কাল। কালে কালে সম্প্রসারিত ও পুষ্ট হয়ে প্রবলাকার ধারণ করে। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের শক্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে, সাম্যবাদীরা এদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে। বামপন্থী চিন্তাও সে সময়ে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। আফ্রো-এশিয় সাহিত্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান পালিত হয়। সুকান্তের কবিতা বিশেষভাবে আদৃত হতে থাকে। গণসঙ্গীত ও গণনাট্যের প্রচলন ঘটে, বিদেশী সাম্যবাদী কবিদের কবিতার অনুবাদ শুরু হয়। ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানের কালে

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে একেবারে পৌঁছে যায় গৃহকুটিরে, রাজপথে, মিছিলে। ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি লগ্নে, লেখক-শিল্পীরা মিছিল সহকারে হাজির হন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে। সেখানে দাঁড়িয়ে ডক্টর আহমদ শরীফের পরিচালনায় তারা হাতভুলে শপথ নেন- আমরা পূর্ব বাংলার সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও চালিয়ে যাবো। সংগ্রামী জনগণকে আমরা অনুপ্রেরণা যোগাব লেখনীর মধ্যদিয়ে, আমাদের লেখনী হবে সংগ্রামের সাফল্যের জন্য বুলেট বেয়নেট। অতীতের সকল মতানৈক্য ভূলে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা এগিয়ে যাব সংগ্রামের সাফল্যের দিকে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট মাইলফলক। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ধারার সূচনা হয়। ১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান, সঙ্গীতানুষ্ঠান, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অব্যাহত থাকে। এসব আলোচনা অনুষ্ঠানে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের বিষয় যেমন উঠে এসেছে তেমনি এদেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নও বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর সারা দেশের স্কুল-কলেজ, গ্রামে-গঞ্জেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য শহীদ মিনার। প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তার ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা ও সংগ্রামী চেতনা, স্বাধীকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা জোরদার হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে ১৯৫৩ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'একুশের সংকলন'। এতে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা

Dhaka University Institutional Repository

যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি নতুন নতুন লেখকেরও জন্ম হয়েছে। এসব লেখার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রবলতর হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাই ২১শে ফেব্রুয়ারীর অবদান অপরিসীম। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মূল্যায়নে আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেছেনঃ ১৯৫৩ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে যদি একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এদেশের নিপীড়িত জনগনের কাছে এ-দিনটি প্রতিবছরই প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের নতুন শপথ গ্রহণের দিন। কোন একটি মাত্র সুনির্ধারিত অন্যায়ের প্রতিবাদে একটিমাত্র আক্রমনের প্রতিরোধে কিংবা কোন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ মুক্তির লক্ষ্যে বছরে পর বছর ধরে এদিনের কর্মতৎপরতা, শ্লোগান, প্রতিজ্ঞা ও বক্তব্য গন্ডিবদ্ধ থাকেনি। এমনকি ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রশ্নেও প্রতিবছর নতুন নতুন শ্লোগান উঠেছে, নতুন নতুন সংগ্রামের শপথ গৃহীত হয়েছে। এভাবেই এই সমস্ত শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে এদেশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাঙ্গালীরা আগেও বহুবার বিজয় দেখেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাঙ্গীলারা কখনই অর্জিত বিজয় ধরে রাখতে পারেনি। বিজয়কে ছিনিয়ে এনেও পরাজিত শত্রুর পথ ধরেই ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব। উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবেলার মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগনের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা।

(১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে ফজলুল হক ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ২১ দফার ভিত্তিতে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করতে সমর্থ হলো। নির্বাচনে জয়লাভ করে ফজলুল হক

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। আর তখনই শুরু হলো হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দী দ্বন্দ্ব)। [রফিক, ১৯৯১;৮৫]।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অসুস্থতার অজুহাতে পাড়ি জমান ইউরোপে। অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল আওয়ামী লীগ মন্ত্রী সভায় যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। নির্বাচনে বিস্ময়কর সাফল্যে জোটের অভ্যন্তরে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে করাচীর ওৎপেতে বসে থাকা সামরিক সমর্থন পুষ্ট শাসকগোষ্ঠী সরকার গঠনের ৪৫দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে আর ফজলুল হককে করে গৃহবন্দী। এভাবে বাঙ্গালী জাতি বিজয় অর্জন করেও হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ঘটনা ভাষা আন্দোলন। ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য লাহোর প্রস্তাবের পর থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ যে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর আত্মদানের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে সাংবিধানিক ভাবে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু বাংলাভাষা ও পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী শাসকদের মনোভাব কখনও পরিবর্তিত হয়নি। পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে তাই বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই অব্যাহত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

(১৯৬৬ সালে বাঙ্গালীদের স্বায়ত্তশ
পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক
মুজিবর রহমান ৬ দফা কর্মসূচী পেশ ক
থেকে বাঙ্গালীরা জাতীয়তাবাদী চেত
রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার, জেল, জু

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীকার আন্দোলনকে আরো তীব্র করে তোলে)। [রফিক, ১৯৯১;৮৬]।

এদেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে বাঙ্গালীর আবহমান সংস্কৃতির সপক্ষে সংগ্রাম। '৫২-র ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয়তা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের ধারাবাহিকতায় এদেশের সংস্কৃতি ও মানসকে রক্ষণশীলতার ধারায় প্রবাহিত করার যে প্রচেষ্টা চলছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম সফল প্রতিরোধের সূচনা ভাষা আন্দোলন থেকে। (১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণা ঐতিহাসিক ২১ দফার অন্যতম দফা ছিল ১লা বৈশাখ জাতীয় ছুটি ঘোষণা করার অঙ্গীকার। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হবার পর তা কার্যকর করা হয়েছিল। কিন্তু তখন তা স্থায়ী হয়নি। আইয়ুব আমলে ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে হিন্দুয়ানীর অভিযোগ এনে অপপ্রচার করা হয়। ষাটের দশকে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী করার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশে এই রক্ষণশীল ধারা কোন সময়ই নিশ্চিহ্ন হয়নি। স্বাধীনতার পর তা স্তিমিত হলেও পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা আরও বেশী জোরদার হয়। [রায়, ১৯৯১;২০]।

পুর্ববর্তী অধ্যায়ে পুর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমি মনে করি যে কোন দেশের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে হলে সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে এদেশের শিল্পীরা বরাবরই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত শিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা অর্জনের পরও যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিল্পী সমাজ ছিলেন সোচ্চার।

'৮২ থেকে '৯০- এই দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেও সংস্কৃতি কর্মীরা লড়ে আসছে প্রথম থেকে। গণতন্ত্র অর্জনের চূড়ান্ত সময়েও কার্ফ্যু, জরুরী অবস্থা ও স্বৈরশাসকের ভয়াবহতাকে উপেক্ষা করে শিল্পীরা রাস্তায় থেমে পড়েন। রাজনৈতিক দল ও জোট এবং ছাত্র-জনতা এরশাদ সরকারের পদত্যাগ দাবী করলে দেশের সমগ্র শিলঈ সমাজও ঐ রাজনৈতিক দল, জোট ও ছাত্র-জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষনা করেন। [চিত্র বাংলা, ১৯৯০;৪৭]

যে কোন ধরণের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিবাদ করার ঐতিহ্য দীর্ঘ দিনের। অদূর অতীতে, ১৯৫২ সালে, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে দেশের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ প্রতিবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেন রাজনৈতিক দলগুলোর আগেই। ১৯৮৩-র ১৯ শে জানুয়ারী ঐক্যবদ্ধভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের আহবান জানিয়ে তারা পত্র-পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন- অপসংস্কৃতির প্রসার ও রক্ষণশীলতার পরিশোষণের ফলে শিল্প ও সংস্কৃতি জগত আজ বিপর্যস্ত হতে চলেছে। আর সে লক্ষ্যেই সকল সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহ একত্রিত হয়ে সেই বিবৃতিতে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন যারা তারা হলেন- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, সুফিয়া কামাল, ডঃ আবু মাহমুদ, ডঃ মোজাফ্র আহমেদ, কবির চৌধুরী, ডঃ আখলাকুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম, শেখ লুঃফর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ডঃ মোশাররফ হোসেন, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডঃ গমুস্তফা নূরুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ রফিকুল ইসলাম, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, গোলাম মুস্তফা এবং কলিম শরাফী।

(৪৩টি প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল 'একুশ উদযাপন কমিটি ১৯৮৪'। অতঃপর এগুলোর সঙ্গে আরো সংগঠন যুক্ত হয়ে ৪৭টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। এই সংগঠনের মধ্যে ছিলেন সাহিত্য সেবী, সংগীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী, নাট্য শিল্পী এবং ঢাকা জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দলসমূহের কর্মীগন)। [মকসুদ, ১৯৯০;১৯]

কমিটির শ্লোগান ছিলঃ "প্রতিরোধ করো প্রতিক্রিয়া, রুখে দাঁড়াও স্বৈরাচার।" সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরণ্যক নাট্যদল, আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যা নিকেতন, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, গণছায়া গণশিল্পী সংস্থা, চারু ও চারুকলা ইনষ্টিটিউট ছাত্রসংসদ, ছায়ানট, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক দল, ডাকসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল, ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা পদাতিক, থিয়েটার নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, নান্দনিক, পদাতিক, বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়ন, প্রাক্সিস অধ্যায়ন সমিতি, বাংলাদেশ গ্রুপ-থিয়েটার ফেডারেশন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, সংগ্রামী সাংস্কৃতিক জোট প্রভৃতি।

শিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীরা একত্রিত হয়ে ১৯৮৫ সালে গঠন করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটে অন্তর্ভূক্ত হয় সর্বস্তরের টিভি, মঞ্চ ও বেতার শিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

একাত্মতা ঘোষণা করে সংস্কৃতি কর্মীরা ১১৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠনও সম্মিলিত সাংস্কৃতি জোটের সালে একাত্মতা ঘোষণা করে। ১৯৮৭ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন একসময় তুঙ্গে পৌঁছে সে সময়ে এই সাংস্কৃতিক জোট পালন করেছিল বিশেষ ভূমিকা। বেতার চিভি ও মঞ্চ ছেড়ে শিল্পীরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে নেমে পড়েন রাস্তায়। (শিল্পীদের প্রতিরোধ করতে এরশাদ সরকার কালো তালিকাভূক্ত করে ১৪জন শিল্পীকে। কিন্তু শিল্পী সমাজের দুর্বার আন্দোলনের মুখে এবং অন্যান্য শিল্পীরা ঐ ১৪জন কালো তালিকাভূক্ত শিল্পীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রেডিও এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সরকারকে বাধ্য হয়ে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে হয়। (চিত্র বাংলা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৪৭]।

১৯৮৭ সারে ১ ফেব্রুয়ী ২দিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু হয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখের সড়ক মোহনায়। উৎসবের শ্লোগান ছিল 'শৃংখল মুক্তির জন্য কবিতা'। ১৯৮৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারী দিত্বীয় জাতীয় কবিতা উৎসব পালন করা হয়। শ্লোগান ছিল - 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা'। চলমান গণআন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে উৎসব শুরু ও শেষ হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বেগম সুফিয়া কামাল। তিনি বলেন, "এটা নিছক উৎসব নয়"। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের জন্য কবিদের অভিনন্দন জানানো হয়। শামসুর রহমান বলেন, "যে সরকারের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য অস্বীকৃত, সে সরকারের সাথে কোন আপোষ নেই"। (উৎসবের দ্বিতীয় দিনের শেষ অনুষ্ঠানের সভাপতি কামরুল হাসান মৃত্যুর কিছুক্ষন আগে এঁকেছিলেন এরশাদের একটি কার্টুন, নীচে লিখেছিলেন- দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে।) [মকসুদ, ১৯৯০;১৬৩]।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারী "সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা" শ্লোগান দিয়ে জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শামসুর রহমান। ডঃ আহমদ শরীফ কবি ও সাহিত্য সেবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আর প্রতিবাদ নয় আজ প্রয়োজন প্রতিরোধ।" ১৯৯০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী 'কবিতা রুখবেই সন্ত্রাস'- এই শ্লোগান দিয়ে চতুর্থ জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, স্বৈরাচার, মৌলবাদ ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এই শ্লোগান এক নতুন উদ্দীপনার জন্ম দিয়েছে। সভাপতি শামসুর রহমান বলেন, আমাদের মাতৃভুমিতে আজ চলছে নানা অন্যায় অবিচার। দেশকে মধ্যযুগে চালনা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে সরকার। স্বৈরাচার বিরোধী প্রত্যয় নিয়ে গণআন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে একটি মিছিল বের করেন কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ।

(১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মিরপুর হরতালের সমর্থনে জনতার বিশাল মিছিলে বিডিআর এর গুলিবর্ষনে ঘটনাস্থলেই ৫জন নিহিত, পরে আরও নিহত হয় ২ জন এবং সারাদেশে নিহত হয় আরও অনেক, গুরুর আহত হয় ছাত্রলীগ নেতা সফি। ঐদিন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিগিলত সাংস্কৃতিক জোটের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।) [মকসুদ ১৯৯০;১৭৯]।

গণতন্ত্রের জন্য এ দেশের জনগনের যে আন্দোলন, সাংস্কৃতিক কর্মীরা সর্বদাই সে আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে। শুধু পালন করেছে এক বিশাল ভুমিকা, পলে স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। পরবর্তীতে সরকার গঠনের মাধ্যমে নিজেকে বৈধ করার একটি অপচেষ্টা চালানোর পর ১৯৮২ থেকে দেশে নতুন করে আন্দোলনের সূচনা ঘটে। রাজনৈতিক দলগুলো এবং ছাত্র জনতা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পদত্যাগ দাবী করলে সংস্কৃতি কর্মীরা সে দাবীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন কর্মীরা নিজেদের আন্দোলন বিস্তৃত করার জন্য ১৯৮৫ সালে গঠন করেন "সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট"। পরবর্তীতে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেগবান করার জন্য বিভিন্ন কর্মসুচী ঘোষণা করে। (সাংস্কৃতিক জোটের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন রেডিও, টেলিভিশন ও মঞ্চের নাট্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা, কবি-সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, আবৃত্তিকার ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীরা। সর্বমোট ১৪৪টি সাংস্কৃতিক সংগঠন এই জোটের অন্তর্ভূক্ত যার আহ্বায়ক কবি ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ)। [ইসলাম, ১৯৯০;১৪]।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব সরকারী বিধি নিষেধ রয়েছে, সেসব উঠিয়ে নেয়ার দাবীর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জোট দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দাবী জানায়। ১৯৮৭ সালে সরকার দেশে জরুরী অবস্থা জারী করলে সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে সংস্কৃতি কর্মীরা রেডিও ও টেলিভিশন বয়কট করেন। তারা রেডিও ও টেলিভিশনের যে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। ফলে এইসব প্রচার মাধ্যমে নতুন অনুষ্ঠান প্রচার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সরকার এক নাজুক অবস্থায় পতিত হয় এবং গণআন্দোলন আরেক নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

সরকার এই অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্য সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্য থেকে ১৪জন শিল্পীকে কালো তালিকাভূক্ত করে। রেডিও, টেলিভিশনে এই ১৪জন শিল্পী নিষিদ্ধ হলেও সাংস্কৃতিক কর্মীদের আন্দোলন কোন অংশে থেমে থাকে না বরং আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অন্যান্য শিল্পীরা অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। ফলে সরকারকে বাধ্য হয়ে এই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিতে হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রচারপত্রে বলা হয়- 'বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও, বর্বর নরঘাতক স্বৈরাশাসন উৎখাত করো'। রেডিও টিভি বর্জনকারী

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পীদের পরিবেশনা নিয়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে 'জনতার জয় সম্প্রসার কেন্দ্র' পুরানা পল্টন মোড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করে। ১০ অক্টোবর '৯০ এরশাদ সরকারে বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা এক অবিস্মরনীয় ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের তীব্রতায় দিশেহারা হয়ে সরকার ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারী করেন এবং ছাত্র জনতাকে ঘরে আবদ্ধ রাখার জন্য সান্ধ্য আইন ঘোষণা করেন। ছাত্র জনতা জরুরী অবস্থা ও সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে দুর্বার আন্দোলনে মেতে উঠে এবং তাদের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সাংস্কৃতিক জোটের কর্মীরা। (১ ি ডসেম্বর '৯০ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মোট প্রেসক্লাবের সামনে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। তারা চলমান আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বলেন- এরশাদকে অবশ্যই পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সেই সমাবেশে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে দশজন লেখক, শিল্পী ও অধ্যাপক গুরুতর আহত হন। তাই একথা আমরা বলতে পারি যে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভূমিকার ফলেই স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল।) [রফিক, ১৯৯০;৬৩]।

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে রাস্তায় লাখো জনতা নেমে পড়ে ৪ ডিসেম্বর। রাস্তায় রাস্তায় এরশাদের আলোচনা ও কৌশলী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিছিল বের হয়। জনতা পথ জুড়ে এরশাদের পদত্যাগের দাবী জানিয়ে শ্লোগান দিয়ে ঘরে ফিরে ঐদিনই রাত ১০টার সংবাদের পর এরশাদ জনরোষ বুঝতে পেরে এবং তার সকল কৌশল ব্যর্থ হলে নাটকীয় ভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। রেডিও- টিভিতে এ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। রাতের কার্ফ্যু ও হিমেল বাতাস এবং কুয়াশা ভেঙ্গে হাজার হাজার জনতা রাজধানীর রাস্তায় নেমে পড়ে। লাখো জনতার উল্লাসে ফেকেট পড়ে রাতের ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

জনতার মিছিলে শ্লোগান ছিল "হৈ হৈ রৈ রৈ এরশাদ গেল কই"। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল জনতার আনন্দ উল্লাসের মিছিল।

৫ ডিসেম্বর '৯০ ঐদিন জনতা কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়ে রাজধানী ঢাকাকে জনসমুদ্রে পরিণত করেছিল। এরশাদের কুশপুত্তলিকা ও ব্যঙ্গ চিত্র ইত্যাদি নিয়ে বড় বড় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের অসংখ্য মিছিল, ব্যান্ডের তালে তালে নৃত্য এবং শহরময় রং ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়েগিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সপরিবারে সাধারণ মানুষ ছাড়াও অফিস- আদালত ফেলে সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রাস্তায় নেমে পড়ে, তারা আবেগাপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন করতে থাকে একে অপরকে। আর তরুনরা রং মেখে সঙ সেজে কোরাস করে রাজধানী মুখরিত করে তোলে এবং বিজয় উৎসবের নগরীতে পরিণত করে। বিজয়ী জনতার জন্য ঐদিন রাজধানীর এই বিশেষ আকর্ষন শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত 'জনতার জয় সম্প্রসার কেন্দ্র'- ঘরমুখো নাগরিকাদেরকেও ঘর থেকে বের করে আনে। রেডিও টিভি'র এরশাদ আমলের গণবিরোধী ভূমিকায় বিদ্রোহী প্রথম সারির প্রায় শতাধিক শিল্পী এতে অংশ নেন। বক্তৃতা, গণসঙ্গীত, আবৃত্তি, খবর প্রচার, অভিনয় ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে টিভির দুটি বিজ্ঞাপনকে পারোডী হিসেবে পরিবেশন করা হয়। '৮৭ সালের গণআন্দোলনের সময় রেডিও টিভির কালো তালিকাভূক্ত সংবাদ পাঠ রামেন্দু মজুমদার ও শামীম আহমেদ ঐ কেন্দ্র থেকে সকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ যখন পাঠ করেন তখন তুমুল করতালির মাধ্যমে জনতা তাদের অভিনন্দিত করেন। '৮৭-র আন্দোলনের পর অবশেষে ঐ অনুষ্ঠানে দু'জনকে টিভিতে খবর পড়তে দেখা যায়। ৬ ডিসেম্বর দেশের অন্যান্য স্থানের মতো ঢাকায়ও আনন্দ উৎসবের জোয়ার বইতে থাকে। পুরানা পল্টনের মোড়ে 'জনতার জয় সম্প্রসার কেন্দ্র' থেকে বিদ্রোহী সংস্কৃতি কর্মীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিবেশনা বিজয়ের আনন্দে কোলাকুলি ইত্যাদি ঘটনা অব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। এইভাবে আনন্দ, হাসি-গান আর শ্লোগান, বর্নাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জনসমুদ্র নামে। রঙে রঙে রাঙানো ছিল গোটা ক্যাম্পাস। লাখো মানুষের আগমনে মুখরিত ক্যাম্পাসে সবার মুখে বিজয়ের হাসি। গণতন্ত্রের বাঁধভাঙ্গা জোয়ার ছিল হাজার হাজার ছাত্র জনতার অফুরন্ত উল্লাসে। জনসমুদ্রে দিনভর বিজয়ের জোয়ার এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি।

জনতার খন্ড খন্ড মিছিলগুলো এলোপাতাড়ি নগরীর বিভিন্ন সড়ক পদক্ষিন করছিল এবং সব মিছিলেই ছিল ব্যাঙ্গত্মক কবিতা শ্লোগান। আর সব শ্লোগানই ছিল স্বৈরাচারী এরশাদের পতন কেন্দ্রিক শিল্পী সমাজের অনেকেই আলাদা আলাদা মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে ছুটতে থাকে। এদের মধ্যে আসাদুজ্জামান নূর, হুমায়ুন ফরিদী, তারিক আনাম, সুর্বনা মোস্তফা, মেঘনা প্রমুখকে প্রথম সারিতে দেখা গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতারা আলাদা আলাদা মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাব চত্তরে ছুটে আসে। ছুটে আসে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ প্রেসক্লাবের সামনে গণসঙ্গীতের আসর বসায়। গোটা মহানগরী আনন্দের নগরীতে পারিণত হবার পর শুরু হয় পটকা ফোটানোর পালা। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা হাততালি দিয়ে দিয়ে মিছিলকারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল। গভীর রাতেই মাইক লাগিয়ে গনসঙ্গীত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষন, গান বাজনা প্রচারিত হতে থাকে। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসহ সকল শ্রেনীর মানুসের স্বতঃস্ফুর্ত আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে সেদিনগুলোর চিত্র ছিল চোখ বাধাবার মতো। দিন বদলের সেই উত্তাল দিনগুলোতে জনতার মুখে ছিল উত্তবান আভা- চোখে ছিল শানিতর ছায়া আর বুক জুড়ে ছিল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের দৃপ্ত শপথ।

১৯৮২ সালে স্বৈরাচার সরকার যখন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, তখন এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে পাঁয়তারা শুরু করেন। আর স্বৈরাচার মদদ যুগিয়ে এসেছে তথাকথিত আমলা, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, কবিতা যখন এদেশের আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কবিরা কাজ করে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় স্বৈরাচার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কতিপয় দালাল এশীয় কবিতা উৎসব নামে জনগন বিবর্জিত অনুষ্ঠান করে বিলাসবুহল হোটেলে। যেখানে সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের কোন অংশগ্রহন ছিল না। এদেশের সংস্কৃতি বিকাশকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্য গঠন করা হয়েছিল 'সংস্কৃতি কমিশন'। স্বৈরাচার সরকার যখন ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে মুছে দেয়ার চক্রান্ত করার জন্য রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে মসজিদের স্থাপত্য নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করে, অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভাবকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ন্যক্কারজনকভাবে প্রববশ করিয়েছে যাতে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব ক্রমশ মুছে যায়।

স্বৈরাচার সরকারের সুপরিকল্পিতহীন চক্রান্তকে দমন করতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভূমিকা অপরিসীম। জোট শুধু বিবৃতি প্রতিবদা করেই ক্ষাত হয়নি এদেশের গণমানুষের চেতনাকে স্ফুরণ ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন করে উন্মুক্ত কবিতা পাঠ, গণসংগীতের আয়োজন করে। এছাড়াও করে শহীদ মিনারে পথ নাটক নাটকের মঞ্চায়ন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গনমানুষের মৌলিক দাবকিে সনাক্ত করার জন্য পর্যাক্রমে কর্মসূচী হাতে নেয়। নিয়মিত পোষ্টার প্রদর্শনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিল্পী কামরুল হাসান তার রং তুলিতে দেশের সরকার প্রধানের চিত্র তুলে ধরেন। কোন ভনিতা না করে তিনি সাহসী আঁচড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে। সাংস্কৃতিক জোট জনগনের রাজনৈতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে বিভিন্ন পথনাটক, গণসংগীতের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক জোট ও দলের পাশপাশি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভূমিকা প্রশংসিত। '৮৭-র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক জোট

Dhaka University Institutional Repository

রেডিও, টেলিভিশন বয়কট করেছিলো। শুধুমাত্র বয়কট করে ক্ষান্ত হননি, জনগনের কাতারে এসে দাঁড়িয়ে জনগনের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। '৮৭-র ভয়াবহ বন্যার সময় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রপীড়িত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী বিতরন শুধু করেনি। গৃহহারাদের জন্য করেছে গৃহদান। কিন্তু স্বৈরাচার সরকার দেশের প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা অপচয় করেন ত্রাণ বিতরণের নামে। সৈরাচার হটাও বিরোধী আন্দোলনে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ধাপে ধাপে রাজনৈতিক আন্দোলনের সাহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে গণঅভ্যথানে পরিণত করতে জোটের ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাজনৈতিক দল ও জোটের দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। স্বৈরাচার সরকারের প্রচার মাধ্যম শিল্পী, কলাকুশলী, সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের টেলিভিশন, রেডিও বর্জনের আহ্বান জানান। দেশে যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট জরুরী অবস্থাকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে। এমনকি পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়।

গণ মানুষের দাবীর মুখে স্বৈরাচার সরকারের পতনের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট বিজয় উৎসবের জন্য বেতার সম্প্রসার কেন্দ্র খোলে। এই সম্প্রচার কেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। স্বতঃস্ফুর্ত দর্শক শ্রোতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান উপভোগ করে। শুধু তাই নয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বিজয় মিছিল ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড় প্রদক্ষিন করে। গণ আন্দোলনে টেলিভিশনের যেটুকু ভূমিকা রাখার প্রয়োজন ছিলো তা মোটেই যথাযথ ভুমিকা পালন করেনি। বরং টেলিভিশনের এক শ্রেণীর দালাল-চাটুকার স্বৈরাচার সরকারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। টেলিভিশনে প্রতিদিন স্বৈরাচার সরকার প্রধানের লেখা সচিত্রগান পরিবেশন করা হয়েছে। টেলিভিশনে যারা

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছিল তাদেরকে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছিলো। এর মধ্যে টেলিভিশনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আল মামুন। টেলিভিশনে সাইফুল বারী সমর্থনপুষ্টদের মধ্যে যারা স্বৈরাচারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মুস্তাফিজুর রহমান, জিয়া আনসারী। মুস্তাফিজুর রহমান স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পরও এরশাদের ছবি নামাননি। পরে সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ ছবি নামিয়ে মুস্তাফিজুর রহমানের টেবিলেই ছবিটি ভাঙেন। টেলিভিশনে যেসব সংবাদ পাঠক-পাঠিকা জোটের আহ্বান উপেক্ষা করে সংবাদ পাঠ করেছিলেন তাদের মধ্যে রেহানা পারভীন, আসমা আহমেদ, সালেহ আকরাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও ছাত্র ঐক্য মিলে বেশ কয়েকজনকে কালো তালিকাভূক্ত করেছিলেন এবং তাদের জনতার আদালতে বিচারের দাবী জানিয়েছিলেন। তারা বলেন টেলিভিশন কোন দল বা কোন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান নয়, তথাপি টেলিভিশনের চাটুকরীতা স্বৈরাচারীর হাতকে আরও পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। টেলিভিশনে চাটুকারিবৃত্তির পরিবেশ যেন কোনভাবে গড়ে উঠতে না পারে এনিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করার সুপারিশ করে।

(সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রচারপত্রে বলা হয় - 'বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও, বর্বর নরঘাতক স্বৈরাশাসন উৎখাত কর)। [চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৬]। রেডিও, টিভি বর্জনকারী শিল্পীদের পরিবেশনা নিয়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে পুরানা পল্টনের মোড়ে জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্র'- এর সকাল সন্ধ্যা অবাধ বিভিণ্ন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান চলতে থাকে এবং তা উপভোগের জন্য সারাদিন ধরে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ রাজধানীর স্বাভাবিক চেহারা আরো বেশি পাল্টে দেয়।ভোর না হতেই মানুষ রাস্তায় নামতে থাকে। শুধু রাজনীতি সংশ্লিষ্ট নারী পুরুষই নয়, অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও মিছিলের সংখ্যাও বাড়থে থাকে। জনতার

Dhaka University Institutional Repository

মূল স্রোত ছিল হাইকোর্ট থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রাজপথে। রাজধানীর যেখানে থেকে যে মিছিলই বেরিয়েছে সবাই অন্ততঃ একবার ঘুরে গেছে এই রাস্তা দিয়ে। জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্র' থেকে উদ্দীপনামূলক পরিবেশনা শুরু হলে পুরানা পল্টন মোড়ে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন। রাজধানীতে দিনভর রং ছোঁড়াছুঁড়ি হয় এবং নির্লিপ্ত পথচারীরাও তার হাত থেকে রেহাই পাননি।

বিজয়ী জনতার জন্য রাজধানীর বিশেষ আকর্ষন শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত 'জনতার জয় সম্প্রচার কেন্দ্র' ঘরমুখো নাগরিকদেরকেও ঘর থেকে বের করে আনে। রেডিও, টিভি'র এরশাদ আমলের গনবিরোধী ভূমিকায় বিদ্রোহী প্রথম সারির প্রায় শতাধিক শিল্পী এতে অংশ নেন। ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ রীতিমতো উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়। আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে এই অনুষ্ঠানে উপভোগ করতে দেখা যায়। বক্তৃতা, গণসঙ্গীত, আবৃত্তি, খবর প্রচার, অভিনয় ছাড়াও টিভির বিজ্ঞাপনকে প্যারোডী হিসেবে পরিবেশন করা হয়। ('৮৭ সালের গণআন্দোলনের সময় রেডিও টিভির কালো তালিকাভুক্ত সংবাদ পাঠক রামেন্দ্র মজুমদার ও শামীম আহমেদ এ কেন্দ্র থেকে সকালে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ যখন পাঠ করেন তখন তুমুল করতালির মাধ্যমে জনতা তাদের অভিনন্দিত করেন।) [চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৭]।

রেডিও টিভির গণবিরোধী ভূমিকার কারণে যেসব শিল্পী দুটি প্রচার মাধ্যম বর্জন করেন তারাসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সংস্কৃতিসেবী ও সংগঠন বিজয় মিছিল ও সম্প্রচার কেন্দ্রে পরিবেশনায় অংশ গ্রহন করে। নগরীর অন্যান্য স্থানসহ সারাদেশে একইভাবে জনতার জয় মিছিল অব্যাহত ছিল। সীমাহীন আনন্দ উল্লাস আর গনতন্ত্রের জোয়ারে ছাত্র -জনতা নেচে নেচে রঙ ছিটিয়েছে। রিক্সা, ভ্যান, টমটম আর ট্রাক, মাইক্রোবাসে মুখোশ

Dhaka University Institutional Repository

পরে সুর করে চিৎকার দিয়ে গেয়েছে এরশাদের পতনের গান। বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন ও টিএসসি এলাকায় ঢল নেমেছিল।

স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পাশাপাশি ফয়েজ আহমেদের নেতৃত্বে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। জরুরী আইন ভঙ্গের মাধ্যমে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট গণবিক্ষোভের সূচনা করে। এদের সঙ্গে সর্বস্তরের পেশাজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সহ সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। স্বৈরশাসন অপরাজেয় ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তির কাছে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

১৯৮২ সালের স্বৈরাচার সরকার যখন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, তখন এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কলুষিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে পায়তারা শুরু করেন। আর স্বৈরাচার মদদ যুগিয়ে তথাকথিত আমলা, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, কবিতা যখন এদেশের আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে ধেয়ার লক্ষ্যে কবিরা কাজ করে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় স্বৈরাচার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কতিপয় দালাল এশীয় কবিতা উৎসব নামে জনগন বিবর্জিত অনুষ্ঠান করছিল বিলাসবহুল হোটেলে। যেখানে সাধারন স্রোতা ও পাঠকের কোন অংশগ্রহণ নেই। এদেশের সংস্কৃতি বিকাশকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্য গঠন করা হয় 'সংস্কৃতি কমিশন'। যে কমিশন ধর্মীয় প্রভাবকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে মুছে দেয়ার চক্রান্ত করার জন্য স্বৈরাচার সরকার রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে মসজিদের স্থাপত্য নির্মাণের কৌশল অবলম্বন করে অর্থাৎ ধর্মীয় প্রভাবকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নেক্কারজনকভাবে প্রবেশ করায় যাতে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব ক্রমশ মুছে যায়। স্বৈরাচার সরকারের সুপরিকল্পিতহীন চক্রান্তকে

Dhaka University Institutional Repository

দমন করতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভূমিকা অপরিসীম। জোট শুধু বিবৃতি প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয়নি এদেশের গনমানুষের চেতানাকে স্ফুরন ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন করে উন্মুক্ত কবিতা পাঠ, গণসঙ্গীতের আয়োজন করে। এছাড়াও শহীদ মিনারে পথ নাটক, নাটক ইত্যাদির মঞ্চায়ন করে। (সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গনমানুষের মৌলিক দাবীকে সনাক্ত করার জন্য পর্যায়ক্রমে কর্মসূচী হাতে নেয়। নিয়মিত পোষ্টার প্রদর্শনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিল্পী কামরুল হাসান তার রং তুলিতে দেশের সরকার প্রধানের চিত্র তুলে ধরেন। কোন ভনিতা না করে তিনি সাহসী আঁচড়ে বুঝিয়ে দিলেন 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে') [রোববার, ১৯৯০;৬৭]।

সাংস্কৃতিক জোট জনগনের রাজনৈতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্ন পথনাটক, গনসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক জোট ও দলের পাশাপাশি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ভূমিকা প্রশংসিত। '৮৭-র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক জোট রেডিও, টিভির অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল। শুধুমাত্র বয়কট করে ক্ষান্ত হয়নি, জনগনের কাতারে এসে দাড়িয়েছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। '৮৭-র বয়াবহ বন্যার সময় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রপীড়িত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী শুধু বিতরণ করেননি, গৃহহারাদের জন্য গৃহদানও করেন। কিন্তু স্বৈরাচার সরকার দেশের এই প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি টাকা অপচয় করেছেন ত্রাণ বিতরণ করার নামে। '৯০ এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করতে জোটের ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দেশে যখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় তখন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট জরুরী অবস্থাকে উপেক্ষা করে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করে। টেলিভিশন সবসময় স্বৈরাচারের বাণী প্রচার করে এসেছে। জনগনের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন তো সংবাদে ঘটেনি

Dhaka University Institutional Repository

বরং স্বৈরাচারী দর্শনে দর্শকদের বিরক্তি ধরিয়েছে। টেলিভিশনের এক শ্রেনীর দালাল চাটুকার স্বৈরাচার সরকারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। টেলিভিশনে প্রতিদিন স্বৈরাচার সরকার প্রধানের লেখা সচিত্র গান পরিবেশন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন সাইফুল বারী ও তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে টেলিভিশনে কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও প্রযোজক। পাশাপাশি কতিপয় শিল্পী, সংবাদ পাঠক ও পাঠিকা। সাংস্কৃতিক জোট অবশ্য দশজনকে কালো তালিকাভূক্ত করার আহবান জানান।

টেলিভিশনে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষকিংবা প্রত্যক্ষ সমর্থন জানিয়েছিল তাদেরকে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছিল। এরমধ্যে টেলিভিশনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আলমামুন। টেলিভিশনে সাইফুলবারী সমর্থন পুষ্টদের মধ্যে যারা স্বৈরাচারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মুস্তাফিজুর রহমান, জিয়া আনসারী। মুস্তাফিজুর রহমান স্বৈরাচার সরকারের পতনের পরও এরশাদের ছবি নামাননি। পরে সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দ ছবি নামিয়ে মুস্তাফিজুর রহমানের টেবিলে ছবি ভাঙেন। টেলিভিশনে যেসব সংবাদ পাঠক-পাঠীকা জোটের আহ্বান উপেক্ষা করে সংবাদ পাঠ করেন তাদের মধ্যে রেহানা পারভীন, আসমা আহমেদ, সালেহ আকরাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ ও রামেন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে '৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন- ফয়েজ আহমেদ 'সাংস্কৃতিক জোট' দীর্ঘ আট বছর যাবৎ স্বৈরাচারী সরকারের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বিরোধী আন্দোলন করে গণতান্ত্রিক মানুষের দাবী পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য। যা রাজনৈতিক জোট দলের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেও বিস্তৃতি ঘটেছে এবং উত্তাল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। পরবর্তীতে যাতে দেশে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় সে ব্যাপারে জোটের আহ্বান রয়েছে। গণমাধ্যম গুলোতে যেন সকল মানুষের মতের প্রতিফলন ঘটে সে ব্যাপারে নির্বাচিত সরকারের প্রতিও সুপারিশ রয়েছে।

রামেন্দ্র মজুমদার বলেন- "সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট" অতীতে যেমন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে, আগামীতেও নিরপেক্ষ নির্দলীয় ভূমিকা পালন করবে। আগামীতে যে সরকার ক্ষমতায় আসুক না কেন গণমাধ্যমগুলো প্রতি আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যেন, রাষ্ট্রের কথা বলতে পারে। এ প্রসঙ্গে রেডিও, টেলিভিশনের কথাই ধরতে পারি। এই দু'টো মাধ্যম যেন কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে। রেডিও, টেলিভিশনকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, যে সরকারই থাক না কেন যেন কোন সময় গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। টেলিভিশনে কর্মরত কর্মকর্তা প্রযোজকের ভূমিকাও এ ব্যাপারে কোন অংশে কম নয়।

(বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন কিন্তু সেই টেলিভিশনের জন্যে এরশাদ শাহীর আমল ছিল ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের একটি কালো অধ্যায় রচনাকাল। প্রায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এ সময়ে মাধ্যমটি। টেলিভিশন সংবাদের ছিল না একটুখানি বিশ্বাসযোগ্যতা। বিবিসি এবং ভোয়া নির্ভর হয়ে পড়েছিল সবাই। টেলিভিশনের নাট্যানুষ্ঠান শুধুমাত্র দর্শকদের কিছুটা হলেও ধরে রেখেছিল। প্রযোজক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অধিকাংশই ছিলেন পরিস্থিতির শিকার। আবার অনেকে স্বৈরাচারের মনতুষ্টির জন্যে এদিক ওদিক না তাকিয়ে সার্ভিস দিয়ে গেছেন। বিনিময়ে পেয়েছেন পদোন্নতি, আর্থিক নিশ্চয়তা এবং নানারকম মাসোহারা। জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সাইফুল খুশী করার জন্য যত রকম স্তুতি, আত্মপ্রচার আর বিরোধীদের নামে

Dhaka University Institutional Repository

অপপ্রচার সবকিছুই ব্যবস্থা করেছিলেন।) [পূর্নিমা, ১৯৯০;২২]। টিভি'র একটি মাত্র লোক স্বৈরাচারের দীর্ঘ আট বছর বিন্দুমাত্র আপোষ করেননি। পরিস্থিতির চাপে পড়েও নিজের বিবেককে টিকিয়ে দেননি। নীরব প্রতিবাদী ও নন, তিনি ছিলেন সরব এবং সবসময়ই এই লোকটি আবদুল্লাহ আল মামুন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তি। অথচ বিগত নয় বছরে তিনি স্বৈরাচারী সরকারের মন যোগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। টিভি চাকুরিতে তাকে করা হলো সুপারসিড। জ্যেষ্ঠত্ব, অভিজ্ঞতা, এমনকি মেধার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অগ্রগন্য। তার পদোন্নতি হয়নি অথচ জুনিয়র একাধিক সহকর্মীকে পদোন্নতি এবং দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাকে ডিঙ্গিয়ে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর টেলিভিশনের সুখ-দুঃখের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কর্মরত মামুন চাকুরীর ক্ষেত্রে নাজেহাল হওয়ার ঘটনাকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। প্রতিবাদের জন্যে সহযোগী হিসেবেও পাননি কাউকে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। টেলিভিশনের আজকের অবস্থানের নেপথ্যে যার শ্রম, মেধা কোন অংশেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। অথচ তাকেই টেলিভিশনের অযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জীবনের ওই ক্রান্তিমগ্নে মামুনের কাছে ছিলেন টেলিভিশনের সহকর্মী, প্রযোজক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ। সর্বস্তরের শিলপী, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকরাও নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতেন। আব্দুল্লাহ আল মামুন নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আস্থাশীর। একসময় তিনি এদেশ ছাড়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেনঅ। বিবিসি থেকে ভাল অফার পেয়েছিল। শেষমেষ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার টিকে গেলে মামুনের কণ্ঠ হয়তো এখন বিবিসি থেকেই শুনতে হতো। কিন্তু জনগনের দাবীর মুখে কোন স্বৈরাচারীই টিকতে পারে না, তা আবারও প্রমাণিত হলো এদেশের মাটিতে। মামুনকে টেলিভিশনে থেকে নির্বাসনের যে ঘৃন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তা ভেস্তে গেছে বরং তিনি ফিরে এসেছেন এবং তা একদম বীরদর্পে টেলিভিশনের

Dhaka University Institutional Repository

উপ-মহাপরিচালক হিসেবে। দেরীতে হলেও তিনি তার পুরস্কার পেয়েছেন।

সকল গণঅভ্যুত্থানের প্রাণের স্পন্দনে ভরে তুলেছিল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সভা সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যম দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে সংস্কৃতি সেবীরা এগিয়ে এসেছিল অবদান রেখেছিল গণআন্দোলন। হরতাল ধর্মঘটের দিনগুলোতে তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। গনসঙ্গীত, সংগ্রামী কবিতা, ছাড়া, বক্তৃতার মাধ্যমে তারা মানুষের প্রত্যয়কে উদ্দীপ্ত করে। সাংস্কৃতিক জোটের অন্যতম নেতা আবেদ খান বলেন, এক এক করে সব শুন্যতা পূরণ করে আন্দোলন তার কাঙ্খিত পথে এগিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, সংস্কৃতি কর্মীরা সবসময় জাতীয় ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে। (বাংলাদেশ জাতীয়বাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক দল (জাসাস)- এর সাধারণ সম্পাদক চুন্নু বলেন, সংস্কৃতি সেবীদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তা প্রানবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ভুমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয়তাবাদী সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাস সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সঙ্গে জোটবদ্ধ কর্মসূচী ছাড়াও একক কর্মসূচী পালন করে। স্বৈরাচারের পতনের সময় শহরের বিভিন্ন স্থানে জাসাস ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। করে। প্রেস ক্লাবের সামনেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে)। [পূর্নিমা ১৯৯০;২০]

'৯০- এর ১০ নভেম্বর সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে মানুষ ছুটে আসে আন্দোলনে যোগ দিতে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রতিবাদী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। গান, কবিতা, ছড়া ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে তারা প্রানবন্ত করে তোলে। সৈয়দ সামসুল হক রচিত কৃষক নেতা নুরুল দীনের চেতনা সমৃদ্ধ "নীলফা আকাশে" কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ করেন টিভি'র তারকা আসাদুজ্জামান নূর। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় পথ সভা ও সমাবেশ।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনে অগ্রনী ভূমিকা পালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ভরে উঠেছিল আনন্দ উল্লাস আর বিজয়ের জয়গানে। আনন্দের ধ্বনি ইথারে ইথারে ভেসে বেড়িয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে মহানগরীর বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বস্তরের জনগন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। আড়াই বছরের শিশু এবং সত্তুর বছরের বৃদ্ধাও এসেছেন। সারাদিন রাত ভর চলছে গান, নৃত্য, আবৃত্তি, বক্তৃতা এবং অভিনয়। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অধিকাংশই এসেছিলেন ক্যাম্পাসে। ঢাকা শহরের সর্বত্র লোক ছাত্র-শ্রমিক জনতার স্বতঃস্ফুর্ত মিছিল একের পর এক যখন টিএসসি চত্তরে এসে জড় হচ্ছিল তখন এলাকাটিকে সাগর সঙ্গমে শত মোহনার মতো মনে হয়েছিল। গান ও সুরে এক মোহনীয় চেহারায় পরিণত হয় ক্যাম্পাস। টিএসসির ছাদ, আশপাশের দেয়াল ও গাছের উপর উঠেও শত শত লোক অনুষ্ঠান উপভোগ করে। (ঘোষণাপত্র পাঠ করেন শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ, কায়সারের কন্যা শমী কায়সার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পাঁচ শিল্পী রফিকুল আলম, রথীন্দ্রনাথ রায়, খুরশীদ আলম, কল্যানী ঘোষ, সুবীর নন্দী, পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল গানটি গেয়ে শোনান। এছাড়াও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন দেশের ক'জন শীর্ষস্থানীয় কবি।) [মাহমুদ, ১৯৯০;১২]।

শুধু মঞ্চ থেকে নয় ক্যাম্পাসের সর্বত্রই ছিলো গান আর গান। খালি গলায় করতালি দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা গান গেয়ে বেড়িয়েছে। এছাড়া দল বেধে ভ্যানগাড়ী কিংবা ট্রাকে চড়ে ছাত্ররা বিভিন্ন সূত্রে

Dhaka University Institutional Repository

বিজয়ের গান গেয়েছে। ট্রাকের অন্যনাম আতংক হলেও অসংখ্য ট্রাক মিছিল ক্যাম্পাসের আনন্দকে দিয়েছিল নতুন মাত্রা। ট্রাকের উপর ছাত্র-ছাত্রীরা বিচিত্র ডিজাইনের পোশাক পরে এবং মাথায় লম্বা টুপি পরে নেচে গেয়ে শ্লোগান সহকারে সারা ক্যাম্পাসকে আনন্দে মাতোয়ার করে তোলে। স্বৈরাচার এরশাদের কুকীর্তির বিবরণ দিয়ে আঁকা কার্টুন, পোষ্টার এবং লিফলেট ছিল দেয়ালে, গাছে সর্বত্র প্রদর্শিত হয় এরশাদের কুকর্মের বর্ননার কার্টুন চিত্র। ক্যাম্পাসে সাড়া জাগানো দু'টি প্রকাশনা ছিল এপিটাফ ও ককটেল। এরশাদকে নিয়ে ব্যাঙ্গাচিত্র ও ছড়া সম্বলিত দু'টো পত্রিকা দেদারে বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও সারাদিন ধরে ক্যাম্পাসে ছড়ানো হয়েছিল। এরশাদ সরকারের দুর্নীতির বয়ান এবং তার সহযোগীদের তালিকা সম্বলিত অসংখ্য লিফলেট।

নারী পুরুষ, ছাত্রী, যুবতী, তরুনী, শিশুসহ হাজারো জনতার এক মহাসমারোহ। একদিন যে এলাকার নিরাপত্তার অভাব, সন্ত্রাস, বোমা আর গুলীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো লোকজন সেখানে নির্বিঘ্নে মেয়েরা গিয়েছে, গৃহবধূরা শিশু সন্তানসহ নিশ্চিন্তে দেখেছে স্বৈরাচারে নির্মম নির্যাতনের চিত্র, কার্টুন, চলচ্চিত্র। শুনেছেন এরশাদ পতনের কাহিনী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই দিনগুলোর কণ্ঠস্বর, গান কবিতা। ('দুর্জয় জনতার দুর্বার যাত্রা'-শ্লোগান নিয়ে '৪ ডিসেম্বর দীর্ঘ ১৮ বছর পর তিনদিন ব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 'বিজয় উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্কৃতিকর্মী পেশাজীবী, শিল্পী- ছাত্র, যুবক, মহিলা, শিশু-কিশোর সংগঠন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে শুরু থেকেই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।) [চিত্রবাংলা, ১৯৯০;২৫]। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ নয়টি মঞ্চে শতশত লোক ভীড় করে সঙ্গীত, নৃত্যানুষ্ঠান, নাটক, আবৃত্তি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধ ও গনআন্দোলনের চলচিত্র প্রদর্শনী, বই মেলা, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ও আলোকচিত্র, স্বৈরাচার বিরোধী কার্টুন, আলোকচিত্র ও পোষ্টার

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনী এবং স্বৈরাচার বিরোধী বইমেলা উপভোগ করে। বিজয় উৎসব '৯০ -এর উদ্যোক্তা ছিল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। ডাকসু ও অন্যান্য সংগঠন। এছাড়াও কামরুল হাসান মঞ্চ, হাসান হাফিজুর রহমান মঞ্চ, শহীদ নূর হোসেন ও ডাঃ মিলন মঞ্চ, আলমগীর কবীর মঞ্চ ও স্বাধীন বাংলা বেতার ও কেন্দ্র এ বিজয় উৎসব '৯০ - এ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে।

শাহ্বাগ, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার এবং হাইকোর্ট পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল বিজয় উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে। ফয়েজ আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা পত্র পাঠ করেন শহীদ আলতাফ মাহমুদের কন্যা শাওন মাহমুদ, বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং কর্মসূচী ঘোষনা করেন রামেন্দ্র মজুমদার। ১৪ ডিসেম্বরের দিন হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে শহীদ রুমীর মা লেখিকা জাহানারা ইমাম 'বিজয় উৎসব'৯০'-এর উদ্বোধন করেন। ১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানটি ছিল প্রানবন্ত এবং উৎসবমুখর। গোট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান বিজয় দিবস পর্যন্ত চলে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চারটি মঞ্চে একযোগে অনুষ্ঠান মালা শুরু হয়। দোয়েল চত্বরের সামনে নির্মিত কামরুল হাসান মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় নাটক। বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় নির্মিত 'হাসান হাফিজুর রহমান মঞ্চে' কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি এবং শাহবাগ যাদুঘরের সামনের রাস্তায় নির্মিত শহীদ নুর হোসেন ও ডাঃ মিলন মঞ্চে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

বাংলা একাডেমীর সামনের রাস্তায় সোহাওয়ার্দী উদ্যানের ফুটপাত ঘেষে আয়োজনক করা হয় মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী। চারুকলা ইনস্টিটিউটে স্বৈরাচার বিরোধী কার্টুন, আলোকচিত্র ও পোষ্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এর সামনের সড়কে চলে স্বৈরাচার বিরোধী চিত্রমালার প্রদর্শনী। হাজার

Dhaka University Institutional Repository

হাজার মানুষের এই সমাবেশ স্বাধীনতার উত্তরকালে আর কোন বিজয় দিবসের প্রাক্কালে দেখা যায়নি। ডাকসুর সাংস্কৃতিক দল স্বোপার্জিত স্বাধীনতার পাদদেশে জামান মঞ্চে নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করে। দেশের খ্যাতিমান সবগুলো নাট্য সংগঠন এই মঞ্চে তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ছায়ানেট, প্রকাশ সাংস্কৃতিক দল, আলতাফ মাহমুদ সঙ্গীত বিদ্যালয়সহ শতাধিক শিল্পী। উৎসবের শেষ দিনে সকালে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার থেকে সর্বস্তরের মানুষের এক বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। অফুরন্ত উচ্ছ্বাস আর আনন্দের এ মিছিলে ব্যনার, ফেষ্টুন, ঢোল, বাঁশি হাতে, মুখোশ পরে, খেলনা অস্ত্র হাতে নিয়ে এ মিছিলটি গোটা নগরী প্রদক্ষিন করে।

সুদীর্ঘ নয় বছর পর শিল্প-ব্যবসা-বানিজ্য, শিক্ষাঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন, ক্রীড়া সংস্কৃতি সর্বত্রই আদর্শহীন লুটেরাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত অন্ধকার যুগের অবসান হয়, নতুন সূর্য আলো ছড়িয়ে উদিত হয়। স্বৈরাচারের ঘোর অমানিশার অন্ধকার শেষে জনতার বিজয়ের লাল সুর্য উদিত হয় বাংলার আকাশ।

মধ্য ৫০-এ ব্রাজিল, ১৯৫৭-৫৮ এর ভেনিজুয়েলা ও কলম্বিয়া, ১৯৪৮ সালের তুরস্ক, ১৯৬৫ এর সুদান এবং ১৯৭৩ সালে থাইল্যান্ডে যে ধারায় ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, সেই ধারায়ই এরশাদ জনতার গণঅভ্যুত্থানের বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ ৬ ডিসেম্বর দেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কর্মভার গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত অধ্যায় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে যা পরবর্তীতে '৯০ এর গণ অভ্যুত্থানকে আরও বেশী জোরদার করে তোলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের

Dhaka University Institutional Repository

মত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান অক্টোবর- ডিসেম্বর চূড়ান্ত রূপধারণ করে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত হইল।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আন্দোলনের চূড়ান্তপর্ব ('৯০- এর গনঅভ্যুত্থান) - অক্টোবর ঃ ডিসেম্বর

Go home and tell them we have left down our life and present for their better future. 'যাও-ঘরে ফিরে এবং তাদের বলো আমরা আমাদের জীবন এবং বর্তমানে তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করে গেলাম'। এই কথাগুলোই উৎকীর্ণ করা আছে গ্রীসের এক স্মৃতি সৌধের এপিটাফে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য উৎকীর্ণ করা এ এপিটাফের সামনে প্রতি বছরই জাতীয় দিবসে গ্রীসবাসীরা সমেত হয়। চেতনায় উদ্ভাসিত হয় সেসব শহীদদের আত্মদানের উপাখ্যান। (আমাদের স্মৃতিসৌধের এপিটাফেও উৎকীর্ণ করা অমরবানী। কিন্তু তারপরও এপিটাফবিহীন অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে একজন শহীদের লাশকে সামনে রেখে বুকের আঁকড়ে রচিত হয়েছে এক জীবন্ত এপিটাফ। অনেক মৃত্যুর পর যে শহীদের আত্মত্যাগ এ এপিটাফের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল তার নাম জেহাদ।) [দীপু, ১৯৯০;৩৪]।

401587

আদর্শগত দ্বন্দ্বের অনৈক্যের সকল পিছু টানের উর্ধ্বে ওঠা এই মহান ঐক্য সরকার বিরোধী আন্দেলনকে টেনে নেয় চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে। ১ অক্টোবর, ৯০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের ডাকে এক ছাত্র কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ, শিক্ষা উপকরণের মূল্যহ্রাস, চাকুরীর সময়সীমা ৩০ বছর ধার্য করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষাসহ ১২ দফা দাবী এই কনভেনশন থেকে উত্থাপন করা হয়। ১২ দফার মধ্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার মানুষের ৪২টি দাবী ছিল। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে ২৬৮টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৩১ জন ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি অংশ নেন।

১০ অক্টোবর'৯০ পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ৮, ৭, ও ৫ দলীয় জোট সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচী পালন করে। গুলীতে নিহত ছাত্র জেহাদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার পর গোটা ক্যাম্পাস প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। দলীয় মতাদর্শ তারা ভুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাকসুসহ ২২টি ছাত্র সংগঠন মিলিত হয়ে গঠন করে 'সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য'। এই দিন বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে উল্লাপাড়া কলেজ ছাত্র জেহাদ, বেল্লাল, জাকির সহ ৬জন নিহত ও ৪জন পুলিশ সহ ৩ শতাধিক আহত হয়।

এই হতাহতের প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর ৩ জোটের আহ্বানে দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ঐদিন সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থেকে একটি মিছিল শাহবাগ মোড়ে এসে পৌঁছলে পুলিশ বেপরোয়া ভাবে লাঠিচার্জ করে। এতে ডাকসুর ভিপি আমানুল্লাহ আমান, জি,এস, খায়রুল কবীর খোকন, ছাত্রলীগ সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল হক প্রধান, নাজিমুদ্দীন আলম, গোলাম মোস্তফা সুজন প্রমুখ। ছাত্র-নেতৃবৃন্দ মারাত্মকভাবে আহত হয়। এর প্রতিবাদে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১৩ অক্টোবর পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। এই ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিগত হয় ঢাকা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ছাত্র মনিরুজ্জামান মনির। মনিরের লাশ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে। (ঐদিন ৮ দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত হন এবং শহীদের রক্ত ছুঁয়ে ছাত্রনেতৃবৃন্দকে শপথ পাঠ করান- যেন বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যায়)। [কামাল, ১৯৯০;৯০]।

Dhaka University Institutional Repository

১২ অক্টোবর, '৯০ ঢাকায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাইরে সারা দেশে শহীদদের স্মরনে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ অক্টোবর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বানে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

হরতাল পালন শেষে ছাত্রঐক্যের এক আনুষ্ঠানিক সভায় ১৫ দিন ব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। ১৬ অক্টোবর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের আহ্বানে সারাদেশে দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ১৭ অক্টোবর সরকার ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

২৩ অক্টোবর ৩ জোটের আহ্বানে সারাদেশে দিনব্যাপী হরতাল এবং উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হয়। ২৭ অক্টোবর ৩ জোটের আহ্বান সারাদেশে পালিত হয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী। ২৮ অক্টোবর সরকার ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্জকে গ্রেফতার করে। ৩০ অক্টোবর শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের এক সভায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো খুলে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। (বাবরী মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশংকায় সরকার ৩১ অক্টোবর ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কারফিউ জারি করে)। [কামাল, ১৯৯০;৯১]

এরপর রেডিও, টেলিভিশন ঘেরাও কর্মসূচী দেয়া হয়। উভয় কর্মসূচীতেই জনতার অংশগ্রহণ যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি এরশাদের দমন পীড়নও বাড়তে থাকে। ছাত্র-জনতা মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। জনতা এরশাদের দমন-পীড়ন হত্যার সকল গ্রন্থি খুলতে খুলতে সামনে অগ্রসর হয়। এরশাদের দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে জনতা প্রতিজ্ঞাতে অনড় ও অবিচল হয়ে উঠে। এরশাদের

Dhaka University Institutional Repository

বাহিনীর হাতে শহীদ জাফর, জয়নালের জীবন বলিদানের কথা স্মরণ করে সকল ছাত্র সংগঠন একত্রিত হয়ে গড়ে তোলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। যুব সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠে যুব সংগ্রাম পরিষদ। পেশাজীবীও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোও ঐক্য গড়ে তুলে ঐক্য মোর্চা গড়ে তোলে। আন্দোলন তুঙ্গে উঠতে থাকে। এরশাদ সরকার ভেবেছিল অন্যান্যবারের মতো এবারও বিরোধী জোট ও দলের কর্মসূচী অভিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ এরশাদের পদত্যাগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম নির্বাচনের দাবী ভেস্তে যাবে।

১ নভেম্বর পংকজ ভট্টাচার্জকে মুক্তি দেয়া হয়। ৫ নভেম্বর সারাদেশে ২৪ ঘন্টাব্যাপী ডাক্তার ধর্মঘট পালিত হয়। (৬ নভেম্বর এক জনসভায় এরশাদ সরকারের উদ্দ্যেশ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও আটদলীয় জোট নেতৃ শেখ হাসিনা বলেন, পথ দেখিয়েছি, ক্ষমতা ছাড়ুন, পথ সোজা, দরজা খোলা- এরশাদ আপনি চলে যান। এরশাদ ও তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এতে ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। জনতার অংশগ্রহণ আন্দোলনের জনপদে বেড়েই চলে।) [ইসলাম, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৪]।

৮ নভেম্বর এরশাদ সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধ সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। ১০ নভেম্বর হরতাল পালিত হয়। ১১ নভেম্বর সরকারী আদেশ উপক্ষো করে ছাত্র-শিক্ষকরা যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। এই ঘটনা সাড়া দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমগ্র দেশ যখন ঐক্যবদ্ধ তখন এরশাদ টিকে থাকার আরেকটি অস্ত্র ছাড়েন ক্যাম্পাসে। নিরু-অভির নেতৃত্বে ছাত্রদলের সশস্ত্র গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯ নভেম্বর ঢাকায় ৮, ৮ ও ৫ দলীয় জোটের জনসমাবেশে এক ঐতিহাসিক ঘোষনা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এরশাদ কিভাবে পদত্যাগ করবেন ইত্যাদি বিষয় এতে বিস্তারিত ঠাঁই পায়। ১৭ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ঢাকায় মন্ত্রীপাড়া ঘেরাও - এর কর্মসূচী পালন করে। এ কর্মসূচী ঠেকাতে স্বয়ং এরশাদ ও তার মন্ত্রী এবং সাঙ্গপাঙ্গরা মন্ত্রীপাড়ার আশেপাশে সভা সমাবেশ করে ঐ কর্মসূচীকে চ্যালেঞ্জের চেষ্টা করে।(প্রকাশ্য দিবালোকে এরশাদের পেটোয়া বাহিনী গুলি বোমা, কাঁদনে গ্যাস সবই ব্যবহার করে। ঐদিন ছাত্রনেতাসহ বহুজন আহত হন।) [ইসলাম, চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৪]

২১ নভেম্বর এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। এরশাদ ও তার মন্ত্রী এবং সহযোগীরা হরতালে জনরোষ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং আলোচনার প্রস্তাব দেন। আন্দোলনের দুই প্রধান নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া সহ অন্যান্যরাও এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

২২ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে হামলা করলে সশস্ত্ররা ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যায়। এরশাদের জাতীয় পার্টি তাদের সমাবেশ থেকে ২৬ নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ করবে বলে ঘোষণা দেয়।

২৩ নভেম্বর সুপ্রীমকোর্ট ভবনে আইনজীবীগণ এক সমাবেশ করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী মনুষত্ব বর্জিত এরশাদকে বজ্রকণ্ঠে আল্লাহপাকের পবিত্র বানী থেকে এক হুঁমিয়ারী উচ্চারন করেন, ওয়ামাকারু ও মাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহ খায়রুল মাকেরীন'। যার বাংলা অনুবাদে তিনি বলেন- 'তুমি চক্রান্ত করেছ, তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি সর্বশ্রেষ্ঠ চক্রান্তকারী' উক্ত সমাবেশেই আইন জগতের আর এক দিকপাল ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ বিশেষ অতিথির

Dhaka University Institutional Repository

ভাষণে এরশাদকে লক্ষ্য করে হুশিয়ারী উচ্চারন করেন এবং বলেন- "আমাদের কালো কোটের মধ্যে কাটা রাইফেল বা পিস্তল থাকে না। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করবই। সূর্যোদয় আসন্ন। ছাত্র-তরুনদের রক্ত আর ঝরাবেন না। শেষ কামড়টি আর দেবেন না। এর ফলভোগের সুযোগ ঘটবে না।) [হালিম, চিত্রবাংলা, ১৯৯০;২৩]

কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। ২৪ নভেম্বর থেকে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য জোট প্রতিরোধ গড়ে তুললো। ২৫ নভেম্বর অভির নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র গ্রুপ এম্বুলেন্স ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং ছাত্র ঐক্যের প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ ঘটনার পর অভিসহ আরো ৬ জনকে ছাত্রদল থেকে বহিস্কার করা হয়। ২৬ নভেম্বর অভি-নীরুরু নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে আবারও হামলা চালানো হয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ২৬ নভেম্বর ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করে। এরশাদ সরকারের গদি টলটলায়মান হয়ে উঠে। এরশাদ সরকার আত্মরক্ষার সকল কৌশল বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। শুরু করে ষড়যন্ত্র। আর এ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হন ছাত্ররা অর্থাৎ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য।

২৭ নভেম্বর রাতে সর্বাত্মক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। গোটা জাতি গর্জে উঠে। ১৫ মিনিটের মধ্যে দেশের সমস্ত বড় বড় শহরের অলিগলি থেকে খন্ড খন্ড মিছিল বের হয়ে রাজপথে লক্ষ লোকের ঢল নামে। সকালে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান মোস্তফা মহসীন মন্টুর, এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ বাসা ঘেরাও করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বুয়েটের একটি মিছিল ঐ মিছিলের সঙ্গে যোগ দেয়।

এদিকে সকালে সাড়ে ১১টার দিকে বুয়েট মিছিলটি রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে টি,এস,সির অভিমুখে যাত্রা করলে একদল

Dhaka University Institutional Repository

সশস্ত্র মাস্তান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে উক্ত মিছিলে গুলিবর্ষন করে। ঐ সময় একটি রিক্সায় টিএসসির মোড় অতিক্রম করেছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ও বিএম-এর মহাসচিব ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও যুগ্ম সচিব ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন। সন্ত্রাসীদের বুলেট কেড়ে নেয় একজন প্রতিভাবান চিকিৎসক মিলনের জীবনকে। ডঃ মিলনের মৃত্যু ঘটনা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এরশাদের বিদায়ের সুরঙ্গ পথ তৈরী হয়। ঐদিন রাতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ রেডিও ও টিভি ভাষণে সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। (একই সঙ্গে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষনা করা হয়। শহরে কারফিউ জারি করা হলেও উত্তেজনা কোন অংশে কমে না। শিক্ষকরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সঙ্গে আইনজীবীরা আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।) [কামাল, ১৯৯০;৯২]।

২৮ নভেম্বর রামপুরা মীরেবাগে আইনশৃংখলা রক্ষাকারীদের গুলিতে প্রাণ হারায় আলমগীর (১২) নামের একজন কিশোর। একই তারিখে খিলগাঁও এলাকায় গৃহবধূ হাসিনা আখতার (২৫) কে প্রান দিতে হয়। প্রান দিতে হয় মগবাজার ওয়ারলেস গেট এলাকার ইউনুস (৩২) ও শুক্রাবাদের সিটি কলেজের ছাত্র মিলন (২২) কে। ঐদিন আরও নিহত হয় পলাশীর মোড়ে হানিফ। ৩০ নভেম্বর পিলখানা এনায়েতগঞ্জ এলাকায় পুলিশের গুলিতে নিহত হয় মুরাদ (২৫)। এছাড়াও পুলিশের চরম বর্বতার শিকার হয়েছে স্কুল ছাত্র নূরে আলম বিদ্যুৎ (১৫), মীরপুরের যুবলীগ কর্মী কাজী নুরুল হুদা (২৪), ৭ মাসের শিশু পুত্র ইমন, আবুল হোসেন (৩০), রিক্সা চালক আঃ আউয়াল, (২৫), মোঃ সরোয়ার হোসেন (১৩), আঃ করিম ভূইয়া (২৭), আবু জাফরল সফি (২৪), মহারাজ (২৫), নিমাই, ফিরোজ, জাহাঙ্গীর সহ ৬০-৭০ জন আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রান মরে গেছে এরশাদীয় বাহিনীর বর্বতার শিকার হয়ে। ঐদিন

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় শহীদদের নামাজে জানাজা ও আত্মার মাগফেরাত কামনা করতে বায়তুল মোকাররম মসজিদে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতা সমবেত হলে পুলিশ বিডিআর ও সেনাবাহিনী বাধা দেয়। জনতা বাধা অতিক্রম করে নামাজ আদায় করে মিছিল করলে পরে তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনেও নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে নারী সমাজ সমাবেশ ও মিছিল করলে লাঠিচার্জ করা হয়। রামপুরায় বাচ্চাকে বুকের দুখ ধাওয়ানোর সময় একজন মাকেও বুলেটবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ঐদিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছির করে। সবখানেই লাঠিচার্জ করা হয়। তারপরও সবখানেই সভা-সমাবেশ অব্যাহত থাকে।

'৯০ এর শেষ প্রান্তে এসে বাংলাদেশে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার বিরোধী যে আন্দোলন হয়েছে তার প্রচারে বিদেশী বেতার, সংবাদ সংস্থা, সংবাদপত্র ও সাময়িকী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে বাংলাদেশে শ্রুত বিদেশী বেতারের 'খবর' আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার ও প্রকাশে বিদেশী গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকবে।

(বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো সেদিন যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন তার জন্যে কয়েকজন সাহসীও দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের নাম ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। তারা হলেন, আতাউদ সামাদ (বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ও বাংলা সার্ভিস), গিয়াস কামাল চৌধুরী (ভিওএ) বাংলা সার্ভিস)। [বিবিসিসহ বিদেশী গণমাধ্যমে দৃষ্টিতে, ১৯৯০;১০]।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক নেতা আর সাধারণ মানুষের বুঝতে বাকী রইল না যে আর নয় প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আর সময় দেয়া সম্ভব নয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মানুষ। তড়িঘড়ি করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাধ্য হন ঘোষণা করতে যে, দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে সংসদ ও প্রেসিডেন্ট পদের জন্য। ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে এবং তিনি নিজেই পদত্যাগ করবেন মনোনয়ন দাখিলের ১৫ দিন আগেই। কিন্তু এতেও হলো না। তিন বিরোধী গোষ্ঠী সরাসরি প্রত্যাখান করেন দৃঢ়ভাবে প্রেসিডেন্টের এই চমক, কারণ তাদের কাছে এটা বিরোধী ঐক্যভাঙ্গার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১ ডিসেম্বর ৩ জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জনতা ও বিডিআর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরনের সংঘর্ষটি হয় ঢাকার মিরপুরে। বিডিআর এর গুলিবর্ষনে মোট ৭ জন প্রান হারান। এছাড়া কাজীপাড়ার ২জন, ডেমরা যাত্রাবাড়ীতে ২জন, নারায়নগঞ্জে ১জন এবং চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ১জন, খুলনায় ১জন গুলিতে নিহত হয়। আহত হন ব্যাপক সংখ্যক।

জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঐদিন পদত্যাগ করেন। এছাড়াও গণআন্দোলনের সমর্থনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনসহ সকল ব্যক্তি মালিকানাধীন জাহাজের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করে এবং গ্রেপ্তার হয় শতাধিক। এরশাদ সরকারের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মতিন ও আরো মন্ত্রীসহ জাতীয়পার্টির ১৯ জন সংসদ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। কয়েকটি মহল্লায় পুলিশ ও বিডিআর এর নির্যাতন বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩ জোট ও অন্যান্য দলসমূহের পক্ষ থেকে ২ ও ৩ ডিসেম্বর সরকারী বেসরকারী কর্মচারীদের বেতন তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ৪ তারিখ থেকে লাগাতার ধর্মঘট ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

২ ডিসেম্বর বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। নারায়নগঞ্জ নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ২জন নিহত হয়। রামপুরা ও মালিবাগে পুলিশ ও বিডিআর এর লরীর ওপর জনতা হামলা করে। বেশ কিছু সংগ্রামী জনতা আহত হয়। সকালে সদরঘাটে ছাত্রদের ভ্রাম্যমান গন আদালতে এরশাদের বিচার শেষে গাছে ঝুলিয়ে তার কুশপুত্তলিকার ফাঁসি দেয়া হয় এবং পূর্বদিনের হত্যার প্রতিবাদে মীরপুরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় ও হাজারো মানুষের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। চট্টগ্রামের চন্দাইশে উপজেলা অফিস ভাংচুর করে এবং চট্টগ্রামের সকল রাইফেলস ক্লাব ও শুটিং ক্লাবের অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ দখলে নিয়ে যায়। ঐদিন এরশাদ বৃটিশ রাষ্ট্রদ্রুতকে সঙ্গে নিয়ে ফরিদপুরের টেকেরহাট যান ব্রীজ উদ্বোধন করতে। বৃটিশ হাই কমিশনার সেখানে তার ভাষণে সরকারকে সংযত হওয়ার উপদেশ দেন। ব্যারিষ্টার হাসনাতকে নাজিউর রহমানের পরিবর্তে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে নিযুক্ত করা হয়। পাড়ায় পাড়ায় সভা অনুষ্ঠানে জন্য কমিশনারদের প্রতি নয়া মেয়র নির্দেশ প্রদান করেন এবং জাতীয় পার্টির মাস্তান বাহিনীকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। (প্রেসক্লাবের সামনে জনতার সমুদ্রে বক্তৃতায় ডাঃ কামাল হোসনে তার ভাষণে বলেন, এরশাদ সরকার 'খুনী' ও অবৈধ। ঐদিন থেকে আইনজীবীরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য আদালত বর্জনের ঘোষণা দেন এবং বিচারপতিদের প্রতিও আদালত বর্জন করা আহ্বান জানানো হয়। ২ ডিসেম্বর সারাদেশে কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।) [সেলিম, চিত্রবাংলা, ১৯৯০;৩২]।

Dhaka University Institutional Repository

৩ ডিসেম্বর ৩ জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ঐদিন রাত বিসিএস (প্রশাসনিক) ক্যাডারের ২০৫ জন সদস্য পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। রাতে এরশাদ রেডিও-টিভি ভাষণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলের ১৫দিন আগে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেয়ার কথা ঘোষণা করলে ৩ জোট উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সারাদেশে বিক্ষোভের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

৪ ডিসেম্বর রাত ১০টায় টিভি খবরে বলা হয় এরশাদ অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজপথে লাখ লাখ মানুষের ঢল নামে। গভীর রাত পর্যন্ত নগরীর রাজপথে হাজার হাজার মানুষ উল্লাস করে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঐদিন বিপুল জনতার বিশাল সমাবেশ ঘটে। সচিবালয় থেকে মিছিল করে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীরা রাস্তায় নামেন। মতিঝিল অফিস পাড়ায় অন্যান্য বিল্ডিং থেকেও কর্মচারীরা বেরিয়ে আসেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শতাধিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেন।

আন্দোলনের সর্বশেষ তথ্যাবলী সম্বলিত ছাত্র ঐক্য পরিষদের বুলেটিন 'বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে'। এর বিপুল প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতি (ওকাব) কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদের সাংবাদিক সম্মেলন বর্জন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় তিন জোটের নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নাম ঠিক করেন বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের।

৫ ডিসেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট সর্বসম্মতভাবে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে। ঐদিন এরশাদ ৪র্থ জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬ ডিসেম্বর সকালে ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। এরপর এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। ঐদিন জনতার অব্যাহত আন্দোলনের জয় চূড়ান্ত হয়। ঐদিন জনতা কয়েকগুনে বৃদ্ধি পেয়ে রাজধানী ঢাকাকে জনমুদ্রে পরিণত করে। এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন ভাষ্যে বলা হয়- এ যেন একাত্তর সালের দখলদার মুক্ত হওয়ার সময়কার আনন্দ উল্লাসের পুনরাবৃত্তি। জাতীয় পতাকা, বঙ্গবন্ধু মুজিব, জিয়াউর রহমান, শেখ হাসিনা আর বেগম জিয়ার বড় বড় ছবি, এরশাদের কুশপুত্তলিকার ও ব্যঙ্গ চিত্র ইত্যাদি নিয়ে বড় বড় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষের অসংখ্য মিছিল, ব্যান্ডের তালে তালে নৃত্য এবং শহরময় রং ছোঁড়াছুঁড়ি এই আনন্দে যোগ দিতে সপরিবারে সাধারণ মানুষদের এবং অফিস-আদালত ফেলে সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাস্তায় নেমে পড়া, আবেগাপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন, রং মেখে সভ সেজে তরুনদের কোরাস ইত্যাদি দৃশ্য ও ঘটনাবলী দিনভর রাজধানীকে মুখরিত করে রাখে এবং বিজয় উৎসবের নগরীতে পরিণত করে।

৮ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় গমন করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মাজারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর তিনি মরহুম জিয়াউর রহমানের মাজারে পুস্পস্তবক অর্পন করেন।

১২ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সরকার রাজনৈতিক দলের চাপে এরশাদ ও তার পত্নীকে গুলশানের একটি বাড়িতে অন্তরীন রাখে। একই সঙ্গে জাতীয় পার্টির মওদুদ আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন সহ ১৫ জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ২ মার্চ (১৯৯১) নির্ধারণ করে। ১৫ ডিসেম্বর পঞ্চম সংসদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর অন্তবর্তীকালীন সরকার এরশাদ ও তার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার জন্যে বিচারপতি আনসার উদ্দিনকে প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৯ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন ২ মার্চের পরিবর্তে ২৭ ফেব্রুয়ারী '৯১ পুনঃ নির্ধারন করে।

২২ ডিসেম্বর ছাত্র শিবির প্রগতিশীল ছাত্রদের ওপর হামলা চালালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে জিয়াউর রহমান ও এরশাদের সামরিক শাসনামলে সামরিক ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্তরা তাদের মুক্তির দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ ঘটনায় ৩ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়।

৩১ ডিসেম্বর বামরাজনীতির কিংবদন্তী নেতা মনি সিংহ পরলোক গমন করেন।

১ জানুয়ারী (১৯৯১) এরশাদের বাসভন থেকে নগদ প্রায় ২ কোটি টাকা পাওয়া যায় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়। ঐদিন জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৭ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের ২৯৭টি আসনে মনোনয়ন প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। ৮ জানুয়ারী জাতীয়তাবাদী দল ২৯২টি আসনে মনোনয়ন প্রদানের লক্ষ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে।

৮ জানুয়ারী এরশাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহার ও দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করা হয়। ১২ জানুয়ারী ক্ষমতাচ্যুত

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি এরশাদকে অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে অভিযুক্ত করে একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি, আওয়ামী লীগ ৮৮টি, জাতীয় পার্টি ৩৫টি জামায়াত ১৮টি আসন লাভ করে। বাকী আসনগুলো পায় অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়নি।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমদ লিখিত এবং আনুষ্ঠনিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন ৬ ডিসেম্বর। তিনি দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং সুষ্ঠুভাবে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সব রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা কামনা করেন। (অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমার কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। আমার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন শেষে আবার বিচারকার্যে ফিরে যেতে চাই। আপনারা দোয়া করবেন আমার মধ্যে যেন কোনরূপ লোভের জন্ম না হয়। কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কেউ একবার ক্ষমতায় গেলে আর তিনি তা ছাড়তে চান না।) [মাহমুদ, চিত্রবাংলা, ১৯৯০;১৪]

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণের পর থেকে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহবুদ্দিন আহমদ ৮ ডিসেম্বর '৯০ রাতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রপতির একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। উপদেষ্টারা হলেন সাবেক অর্থ সচিব কফিউদ্দীন মাহমুদ, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফকরুদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি ডাঃ এম এ মাজেদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, জি, কিবরিয়া এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন জল পরিবহন সংস্থার (বিআইডব্লিউটিসি) সাবেক চেয়ারম্যান মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) প্রমুখ।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহমদ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং দৃপ্ত ঘোষণা করেন তার প্রতি রাজনৈতিক নেতা, কর্মী এবং সর্বস্তরের জনগনের সর্বাত্মক সহযোগিতার ফলে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, নির্যাতন, শহীদী রক্তের ঋণ সার্থক হয়েছে। জনগনের সম্পদ লুটপাট করে বাইরে টাকার পাহাড় গড়ার ইতিহাস এরশাদ সরকারে আমলেই বেশী হয়েছে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বলতে গত ৮ বছরে দেশে একেবারেই ছিল না। মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা কেউ বললেও পত্র-পত্রিকায় লেখা যায়নি। মানুষ না খেয়ে মরেছে একথা মানুষ জানতে পারেনি। এই যে মানুষের খবর থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার ইতিহাস, এরশাদের আমলেই ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।

সামাজিক জীবনে এই সার্বক্ষনিক বন্ধাত্ব, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, কথা দিয়ে কথা না রাখার রাজনীতি আর জনগনের অর্থ সম্পদ লুট পাটের ঘৃন্যতার কারনেই স্বৈরাচার উৎখাতের পর সর্বস্তরের মানুষের মন-মানসিকতা আর হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এতো আনন্দ, এতো উল্লাস। এ উল্লাস শুধু রাজপথেই দেখা যায় না। এ উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গভবনেও যেখানে রাজা বাদশাহের বসবাস।

আমি মনে করি এ অভ্যুত্থানে সর্বস্তরের মানুষ শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং পরবর্তীতে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

১৯৬৯ থেকে ১৯৯০। জেনারেল খান থেকে জেনারেল এরশাদ। মাঝখানে গড়িয়েছে দুটি দশক। ঊনসত্তরে জনতার দৃপ্তপদভারে সাগরের প্রচন্ড উর্মিমালার মতো রাজপথে সূচিত হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান।প্রবল জোয়ারের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল সামরিকজান্তা একনায়ক আইয়ূব খানের তখতে তাউস। জয় হয়েছিল জনতার। তারই পথ ধরে '৭১-এ অর্জিত হয়েছিল বাঙ্গালী জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই চূড়ান্ত বিজয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মহান নেতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সাড়ে ৭ কোটি মানুষ সেদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো। তারপর থেকে সময় গড়িয়েছে তার নিজ গতিতে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ ক্রমাগত কুক্ষিগত হতে থাকলো একটি কেন্দ্রবিন্দুতে। সর্বশেষ জগদ্দল পাথরের মতো তা চেপে বসলো জাতির বুকের ওপর।

১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় জাতির ইতিহাস রচিত হয়েছে উল্টোভাবে। এই ইতিহাসের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে দমন-পীড়ন আর অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনী। কিন্তু সবকিছুরই তো একটা শেষ থাকে। অবিনশ্বর এই পৃথিবীতে কোন কিছুইতো চিরস্থায়ী নয়। অথচ স্বৈরশাসকরা একথাটি বেমালুম ভুলে যান। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চায় না তারা। দেশে বিদেশে এমনি স্বৈরশাসকের একথাটি বেমালুম ভুলে যান। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চায় না তারা।

Dhaka University Institutional Repository

দেশে-বিদেশে এমনি স্বৈরশাসকের উত্থান-পতন হরহামেশাই পরিলক্ষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। একথা সকলেই জানেন যে জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগনকে বাদ দিয়ে জমিনের যুদ্ধে পরাজয় এতো ইতিহাসের অব্যর্থ বিধান। জনগনের গ্রহণযোগ্যতা ঐকমত্যে না গিয়ে বদলপী একনায়কের মতো আচরণ করলে ইতিহাস ঠিক সেই অনুপাতেই ধিক্কার দেয়। (যেমন- ইতিহাস ধিক্কার দিয়েছে ফরাসী দেশের সম্রাট দ্যাগল জনমতকে তোয়াক্কা করেননি। বিশ্বাস্থিতির বাধ্য নির্দেশগুলোকেও পাত্তা দেননি। জাতীয়তাবাদের শিখরে আরোহন করে তিনি আমেরিকাকে বুড়ো আংগুল দেখিয়েছিলেন এবং বৃটেনকে অসভ্য বলে গালি দিয়েছিলেন। জনমতের প্রতি অবজ্ঞার কারণে লৌহমানব আয়ূব, আফগান রাজ দাউদ, পারস্যের রেজা শাহ্ পাহ্লবী, ইদি আমীন- সবাইকেই ক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার বহু আগেই মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে)। [রহমান, ১৯৯০;৭]।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিচারপতি সাত্তারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন জেনারেল এরশাদ। প্রথমে দেশে সামরিক শাসন ও পরে সরকারী দল গঠন করে ৯টি বছর এদেশকে বিধ্বস্ত করে গেছেন তিনি। সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার পতনের আগে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছিল এদেশবাসীকে। এরশাদ জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে দীর্ঘ নয় বছর। এই নয় বছরের আন্দোলনে শতাধিক প্রান ঝড়েছে। ৭১- এর রক্তের বিনিময়ে যে স্বদেশ আমরা পেয়েছিলাম, ৯০ প্রজন্মের রক্তে সেই স্বদেশকেই আমরা নুতন করে পেলাম।

পৃথিবীর মানচিত্রে ৭১- এ নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, তখন মানুষ গণতন্ত্রের স্বাদ পুরোপুরি পায়নি। স্বাধীনতার পর একটি সংবিধান পাওয়া গেছে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর অন্যতম বলে পরিচিতি পায়। কিন্তু সেই সংবিধান কার্যকর হবার

Dhaka University Institutional Repository

পর থেকে বারবার ব্যবচ্ছেদের শিকার হয়েছে। এই পর্যন্ত যে সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে, তারা সবাই এই সংবিধানের অনেক ধারা বাতিল করেছে। জুড়ে দিয়েছে নতুন নতুন ধারা, উপধারা। সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার যেভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল তার স্বাদ জনগন পায়নি। বরং এই সংবিধানের সবচেয়ে কঠোর ব্যবস্থা জরুরী অবস্থা জারির সুযোগ নিয়েছে প্রতিটি সরকারই। এদেশের মানুষ আশা নিয়ে '৭১- এ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল সেই আশা পুরণ হয়নি। অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন তারা দেখেছিল তা পূরণ হয়নি। গণতন্ত্রের দাবীতে আইয়ুব বিরোধী যেসকল গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল '৬৯- এর, তাও পূরণ হয়নি। অথচ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে কম রক্ত ঝড়েনি। সেই আন্দোলনেও ছাত্রসমাজ নেতৃত্ব দিয়েছিল। গণঅভ্যুত্থান- ৬৯ সফল হয়েছিল।জেনারেল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। গণঅভ্যুত্থান-৯০ সফল হয়েছে আরেক জেনারেল এরশাদের পতনের পর। আইয়ুব পালন করেছিলেন উন্নয়ন দশক। এরশাদ উদ্‌যাপন করেছিলেন উন্নয়নের ৮ বছর। আইয়ূবের মত উন্নয়ন দশক পালনের খায়েশ এরশাদেরও ছিল। কিন্তু তা পূরণ হলো না। জনগনের রুদ্র রোষে এরশাদ শাহীর পতন হয় ৯০- এর শেষ পর্বে।

গণঅভ্যুত্থান-৯০ সম্পর্কে অনেকে একে '৬৯ এর অভ্যুত্থানের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বৃহত্তর বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ করে ১ অক্টোবর ছাত্র কনভেশন, ১০ অক্টোবরে ঢাকায় সচিবালয় অবরোধ দিলে জেহাদ নিহত, ১১ অক্টোবর হরতালে ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রনেতাদের ওপর পুলিশ নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে সারাদেশে ছাত্র আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্ররা বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতাদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করতে থাকে অবৈধ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবীর পূর্বশর্ত পূরণ হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা দেয়ার জন্যে। ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট বৈঠকের পর বৈঠক করেও মতৈক্যে আসতে পারছিল

Dhaka University Institutional Repository

না। ছাত্র ঐক্যের নেতারা জোট নেতাদের সাথে দেখা করে জানিয়ে দেয় ২০ ও ২১ নভেম্বরের হরতালের আগে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা দিতে।

সরকার এই রূপরেখা পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিল। সরকারের প্রেসিডেন্ট এরশাদ, ব্যারিষ্টার মওদুদ, প্রধানমন্ত্রী, কাজী জাফর, উপপ্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখ এই রূপরেখা পাত্তা দিতে চাননি। কিন্তু জনতার দাবীর মুখে এরশাদ ও তার দোসরদের শোচনীয় পতন ঘটে। বিরোধী দলের রূপরেখা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন জেনারেল এরশাদ। বিচারপতি শাহবুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও বিরোধী দলের সম্মিলিত উদ্যোগেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে পূর্ন হয় গণঅভ্যুত্থান - ৯০ এর দাবী।

ফিলিপাইনের মার্কোস, পানামার নরিয়েগার পরিণতির কথা সকলেরই মনে জাগ্রত আছে। তবুও একথাই সত্যি যে, ক্ষমতায় থেকে স্বৈরাচার কখনও এসব বিদ্যাভাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠে না। জেনারেল এরশাদই বা কিভাবে তার ব্যতিক্রম হবেন? ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কি করেননি তিনি? জনমত শুধু উপক্ষো নয়- জনগনের ওপর অত্যাচার নিপীড়নের ষ্ট্রীমরোলার চালিয়েও তিনি ক্ষান্ত হননি। কিন্তু ইতিহাস কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তার প্রাপ্য। সুদীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকা স্বৈরাশাসক কি ভেবেছিলেন একদিন জনতার রুদ্ররোষে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়বে তার তখতে তাউস? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। দুঃসাহসী ছাত্র-জনতার সম্মিলিত গণ আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ক্ষমতার পাদপ্রদীপ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যবদ্ধ গণদাবী আর সর্বস্তরের মানুষের মরণপণ আন্দোলনের মুখে ভেসে গেল এরশাদ শাহীর দুঃশাসনের নির্মম দমননীতি, হত্যা, খুন, নির্যাতন, জরুরী অবস্থা ও কারফিউকে উপেক্ষা করে যে অদম্য সাহস ও বীরত্বগাঁথা রচনা করেছে তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের আকাশ থেকে জেনারেল এরশাদের মতো এক অশুভ নক্ষত্রের কক্ষ্যচ্যুতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

এখানে একটি কথা না বললে ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তা হলো- এদেশের ছাত্র সমাজ। (অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৬২- এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯- এর গণআন্দোলন সর্বোপরি '৭১ এর সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের সোপান ও বিজয় সুনিশ্চিত করেছে এদেশেরই ছাত্র যুব সমাজ। কালে কালে যুগে যুগে দামাল ছাত্র সমাজের মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা ও ছয়চিত্ত প্রত্যয় স্বৈরাশাসকদের ভিত খান খান করে গুড়িয়ে দিয়েছে। এরশাদ শাহীর পতন হতো না যদি না বাংলার ছাত্র-যুব সমাজ রাজপথে নেমে না আসতো।) [রহমান, ১৯৯০;৭]।

এক দীর্ঘ আন্দোলনের পর বিজয় হয় জনগনের। স্বৈরশাসক জনগনের কাছে পরাজিত হয়। উন্মোচিত হয় গনতন্ত্রের ফলক। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহ প্রায় ৯ বছর ধরে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগনের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন করে তার সফল সমাপ্তি করে ৪ ডিসেম্বর। জনগনের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় স্বৈরাচারী এরশাদ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহজ সরল পথ।

১৯৯০ সালের শেষ ক'টি মাস বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে খুব দ্রুত। সরকারের দুর্নীতি ও অনাচার অর্থনৈতিক সংকটের শুরু করে বছরের প্রথম দিকেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধি, আমদানী-ব্যবসায় দুর্নীতি, বিদেশে সম্পদ পাচার এবং উৎকোচ ও চুরির হিস্যা বৃদ্ধির জন্য অস্বাভাবিক হারে বিভিন্ন প্রকল্প খরচ বৃদ্ধি- এসব কারণে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেয়। বিভিন্ন মূল্যমানে আসে বিকৃতি ও বিনিয়োগে দেখা দেয় দারুন মন্দা। '৯০ এর এপ্রিলে সাহায্য সংস্থার বার্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সরকারের স্বেচ্ছাচারীতা ও অবৈধতাই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার জন্য দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেই সময় অর্থমন্ত্রীকে বিতাড়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর পদত্যাগ (মার্চ, ১৯৯০) সংকটটিকে আরো জোরদার করে। এর কিছুদিন পরে ইরাকের কুয়েত দখলের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর নিদারুন চাপ সৃষ্টি হয়। প্রথমত পেট্রোলের দাম বাড়ায় গোটা জাতি বিপর্যস্ত হয়। কুয়েত ও ইরাকে চাকুরীরত প্রায় এক লক্ষ বাঙালী গৃহহীন ও বেকার হয়ে যায়। একদিকে মানুষের রোজগার কমতে থাকে আবার অন্যদিকে দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে। ফলে আসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়।

শেষ পর্যন্ত ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতার মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হলো। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের এই পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত নাটকীয়। ১০ অক্টোবরের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে বিরোধী জোট ও দলসমূহ যে সরকার বিরোধী আন্দোলন নতুন করে শুরু করেন সেই আন্দোলনকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন অমিত সাহস ও দৃঢ়তার সংগে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। সরকার তার সমর্থকপেশী পুরুষদের ব্যবহার করে, আন্দোলনরত ছাত্র জনতার রক্ত ঝড়িয়ে, কার্ফ্যু দিয়ে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, এক কথায় জুলুম-পীড়নের সকল পন্থা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের সর্বস্তরের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে শেষ পর্যায়ে দেশের সশস্ত্র বাহিনীও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা জনমনে বিপুল উল্লাসের সঞ্চার করে। গভীর রাতে হাজার হাজার নারী পুরুষ, ছাত্র, যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে। এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় উল্লাস প্রত্যক্ষ করেছে, প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিজয় উল্লাস। সেই বিজয় উল্লাসের পুরনো স্মৃতির সংগে নতুন করে যুক্ত হয় ৯০- এর গণআন্দোলনের বিজয় উল্লাসের অবিস্মরনীয় ঘটনা।

প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বঙ্গভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। (দায়িত্বভার গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগ গণতন্ত্রের বিজয়। আজ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। এই সন্ধিক্ষনে আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়েছি। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এটা আজ দেশবাসীর দাবী।" দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে সাহায্য-সহযোগিতার আকুল আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার এইপদে আসার একমাত্র কারণ দেশের শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে এনে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।' তিনি আরও স্মরন করিয়ে দেন যে, 'বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। পাকিস্তান থেকে আমরা সরে এসেছিলাম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই বাংলাদেশের সৃষ্টি। সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি, অনেক বাধা এসেছে। এখন আবার সেই সুযোগ এসেছে। সেই সুযোগকে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারলেই সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গনতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছেন তাদের ওপর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরাট দায়িত্ব বর্তেছে। তাই যারা স্বৈরশাসনের ছত্রছায়ায় থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েছে তাদের খাতে আইনানুগ বিচার হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে, দলীয় স্বার্থে তাদের যাতে আশ্রয়-প্রশয় না দেয়া হয়। তাহলে আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থ হবে। তবে আমাদের সকলের মনে রাখতে হবে দেশে দীর্ঘকাল ব্যাপী স্বৈরশাসন চালু থাকার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে নীতিহীনতা, সুবিধাবাদ, দুর্নীতি শিকড় গেড়েছে তা এক লহমায় উপড়ে ফেলা যাবে না। প্রথমে রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সৎ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের পালন করতে হবে সক্রিয় ভূমিকা। স্বাধীনতার জন্য, গণতন্ত্রের জন্য এদেশের ছাত্র-জনতা অনেক রক্ত দিয়েছে, অনেক জীবন দিয়েছে। গণতান্ত্রিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শহীদদের আত্মত্যাগ স্বার্থক হবে।

'৯০- এ আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতি ঘটে ৪ ডিসেম্বর রাতে স্বৈরাচারী এরশাদের পদত্যাগ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এ বছরটিতে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটে যা অতীতের সকল কালো অধ্যায়কে ছাড়িয়ে যায়। এরশাদ ও তার দোসরেরা ক্ষমতার মসনদকে টিকিয়ে রাখার জন্য ছাত্র নামধারী মাস্তান ও অশুভ পেশাশক্তির হাতে আগেয়াস্ত্র তুলে দেয়। ফলে পুরো বছরই ছাত্রসমাজ ছিল আন্দোলন মুখর। স্বৈরশাসকের বিদায়কে ত্বরান্বিত করার জন্য ছাত্র-সমাজ যে ত্যাগ, ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দেয় তা চিরস্মরণীয়। সরকার সকল সময়ই আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছাত্র সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টায় ছিল। লাখ লাখ টাকা, পারমিট লাইসেন্স এমনকি বাড়িঘর নির্মাণ করে দেয়ার মতো সকল রকম অবৈধ সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব পর্যন্ত পাঠিয়েছিল ছাত্র নেতাদের কাছে। প্রথম কাতারের ছাত্র নেতাদের প্রাননাশের হুমকি দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করে স্বৈরাচার শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্ন করে এবং নিরীহ সাধারণ ছাত্রকে হত্যা করে। আগ্নেয়াস্ত্র ও অবৈধ অর্থ সরবরাহকারী স্বৈরশাসক ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ভাড়াটিয়া খুনীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপ্রবেশ করায়। অশুভ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহকে বছরের সকল সময়ই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস সৃষ্টির ইন্ধন যোগায় সরকার। ছাত্রঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যে নিয়োজিত পুলিশ ও আধা সরকারী বাহিনীর কতিপয় সদস্য যখন ব্যর্থ হয় তখন সরকার সশস্ত্র চিহ্নিত মাস্তানদের লেলিয়ে বিদ্যাপীঠগুলোতে।

'৯০ সালে ছিলো রাজনৈতিক অসন্তোষ আর ধর্মঘটের বছর। প্রায় সকল শ্রেনী ও পেশার মানুষ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, সাংবাদিক সমাজ গনতন্ত্রের দাবীতে ধর্মঘট পালন করে। আন্দোলনে চিকিৎসক সমাজের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত স্বতস্ফুর্ত ও প্রত্যয়পূর্ণ। চিকিৎসকরা এর আগে কখনো এরকম সংগঠিত ছিলেন না। শিক্ষক সমাজ, পরিবহন শ্রমিক, আইনজীবীরা বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট পালন করেন। দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠে। স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর জোটবদ্ধ আন্দোলন, বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনগুলো পুরো বছরই ছিলো রাজপথে। শেষ পর্যন্ত সেই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে, জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস। স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটেছে ৬ ডিসেম্বর।

রক্তক্ষয়ী ও বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ছাত্র, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী, শ্রমিক ও জনগনের জীবনবাজি রাখা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবসান হয় এরশাদ সাহেবের কালো শাসনের অধ্যায়। ছাত্র সমাজের ঐক্য এবং ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে তিনজোটের অভিন্ন রূপ রেখা ক্ষুব্ধ মানুষকে অকুতোভয় হয়ে উঠতে প্রেরণা জোগায়। দাতা দেশগুলি অভিমত ব্যক্ত করে,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সপক্ষে। পরিনতিতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এরশাদ সাহেব ও তার সরকার। আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর দাবী অনুসারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ২৭ ফেব্রুয়ারী ঘোষিত হয় সংসদ নির্বাচন।

১৯৯০ সালের শেষ কয়েকটি মাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সরকারের দুর্নীতি ও অনাচার বছরের শুরুতে একটি অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, আমদানী ব্যবসায় দুর্নীতি, বিদেশে সম্পদ প্রচার এবং উৎকোচ ও চুরির হিস্যা বৃদ্ধির জন্য অস্বাভাবিক হারে প্রকল্প খরচ বৃদ্ধির কারণে একদিকে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের বাহুল্য। আর অন্যদিকে মূলধনের উৎপাদিতা হ্রাস গোটা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় নানারকম ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেয়। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও অবৈধতাই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার জন্য দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলো না। এই সময়ে অর্থমন্ত্রীকে বিতাড়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর পদত্যাগ (মার্চ, ১৯৯০) সংকটটিকে আরো জোরদার করে।

(ইরাকের কুয়েদ দখলের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর নিদারুন চাপ সৃষ্টি হয়। প্রথমত প্রেট্রোলের দাম বাড়ায় গোটা জাতি বিপর্যস্ত হয়। কুয়েত ও ইরাকে চাকুরীরত প্রায় এক লক্ষ বাঙালী গৃহহীন ও বেকার হয়ে যায়। একদিকে মানুষের রোজগার কমে আবার অন্যদিকে দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে অসন্তোষ তাতে বেড়েই চলে।) [মুহিত, ১৯৯১;২৫৭]।

এরশাদের পতন বাংলাদেশের উনিশ বছরের ইতিহাসে একটি সত্যিকারের বিপ্লব। ১৯৭১- এর বিজয় প্রতি বিপ্লবে ধ্বংস হয়ে যায়। এরশাদের নয় বছর যেভাবে জাতির চরিত্র হনন ও প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় নিয়ে আসে তা বস্তুততই অবর্ণনীয়। জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদের দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা এবং জালিয়াতিই তাঁর পতন নিয়ে আসে। ছাত্র জনতার ঐক্য বাংলাদেশে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। ভাষা আন্দোলনে এই ঐক্য কাজ করেছে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয় এই ঐক্য এনে দিয়েছে। আইয়ুব শাহীর পতনে এই ঐক্য কাজ করেছে। ছয় দফার দাবীতে এই ঐক্য সোচ্চার হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের মেষ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে এই ঐক্য নিরস্ত্র জনতার বিজয় সাধন করেছে। আবার ১৯৯০ সালের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে এই ঐক্যই স্বৈরাশাসনের কবর রচনা করেছে। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর '৯০ রাতে দীর্ঘ ৯য় বছর পর বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৮২ সাল থেকে গেড়ে বসা স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। এরশাদকে অপমানজনকভাবে বিদায় নিতে হয়। তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর ৫ ডিসেম্বর সারাদেশে উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। নারী, পুরুষ, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসে উল্লাস প্রকাশ করে নৃত্যমুখর হয়ে উঠে।

(৬ ডিসেম্বর এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবউদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন। উল্লেখ্য, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার পাশাপাশি দেশের সর্বস্তরের শিল্পী সমাজ, বিশেষত তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ভূমিকাও ভূলবার নয়।) [হান্নান, ১৯৯০;১৮]

দীর্ঘ ৯ বছরের সামরিক স্বৈরশাসনের অবসানের পর বাংলার মানুষ শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠে। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন তাঁর তিন মাসের শাসনকালে ন্যায় পরায়নতা, নিরপেক্ষতা, সততা ও বিচক্ষনতার জন্য কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী দেশে সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের এই নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৪০টি আসন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ৮৮টি আসন লাভ করে। তবে গণআন্দোলনে বিতাড়িত এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিও ৩৫টি আসন লাভে সমর্থ হয়।

(বিগত ২৫ বছরে আমরা কি পেয়েছি? যে স্বপ্ন নিয়ে বাঙালী জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল সেই স্বপ্ন কি আজো পূরণ হতে পেরেছে? বরং পাক শাসকদের দোসররা নির্মমভাবে সপরিবারের জাতির জনককে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে জাতীয় ৪ নেতাকে। শুধু তাই নয় সেনাবাাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হত্যা করে তাদের স্থলে পাকিস্তানপন্থীদের বসানো হয়েছে। যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতি বছরের পর বছর লড়াই, সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, নিপীড়ন, নির্যাতন সহ্য করেছিল, রাজপথে রক্ত ঝড়িয়েছিল। ঠিক এই ভাবে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর স্বৈরশাসকদের কালোথাবা বাঙালী জাতিকে ক্ষত বিক্ষত করেছে।) [কামাল, ১৯৯৮;১১]

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর মোট ৩,১৭৬ দিন। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনকাল। বাঙালী জাতির রাজনীতির ইতিহাসে আর এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। দমন-পীড়ন, খুন-হত্যা, মৌলিক অধিকার হরণ, জেল- জুলুম আর অবাধ লুণ্ঠনের ইতিহাস একদিকে। অপরদিকে গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই- সংগ্রামের এক গৌরবৌজ্জ্বল অধ্যায়। এ বিজয় নতুন প্রজন্ম যারা '৭১-এর বিজয় ও ১০ই জানুয়ারীর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপভোগ করেনি, তাদের নিকট এক অমীয়সুধা, প্রাণচাঞ্চল্য আনন্দ। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকেই ছাত্র সমাজ এরশাদের অবৈধ শাসনের পতনের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলো, শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের দীর্ঘ পথ পেড়িয়ে ১৯৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সে বিজয় সূচিত হয়।

দীর্ঘ নয় বছরের একটানা সংগ্রামের মাধ্যমে ঘুমন্ত বাঙালী জাতি আরেকটি গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে। এ গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ের মাধ্যমে দেশের সকল জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তিনজোট ঘোষিত রূপরেখার মাধ্যমেই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগন রায় দেয়। সেই রূপরেখায় আছে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পথ চিরতরে বন্ধ করা। সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশ পরিচালনা। দেশে স্থায়ী গণতান্ত্রিক কাঠমো গড়ে তোলা। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন পরে তারাও একইভাবে ক্ষমতাচ্যুত হন। নিহত হন জিয়াউর রহমান। মোট কথা দেশ থেকে স্বৈরাশাসকের রাজনীতির দিন ফুরিয়ে গেছে। সর্বস্তরের জনগন আজ একটি বিষয়ে একমত যে, পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করতে হবে। এ প্রত্যয়েই গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

আলী, সৈয়দ মকসুদ 'গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০', ঢাকা, ১৯৯০।

ইসলাম, মেজর রফিকুল 'স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০', ঢাকা, ১৯৯১।

ইসলাম, তারিক-উল 'জয় জনতার জয়-এরশাদের দুঃশাসনের অবসান, চিত্রবাংলা, ডিসেম্বর', ১৯৯০।

কামাল, মোস্তফা 'বঙ্গবন্দু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮২-৯০', ঢাকা, ১৯৯০।

দীপু, এনামুর রেজা 'গণঅভ্যুত্থানের নিউক্লিয়াস-সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য', চিত্রবাংলা, অক্টোবর-১৯৯০।

নন্দিতা, 'আন্দোলনের মোর কোন দিকে?' সাপ্তাহিক রোববার, নভেম্বর:৪ ঢাকা, ১৯৯০।

মানিক, নাজিমুদ্দীন, 'একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন' ঢাকা,১৯৯৮।

মাহমুদ, জীসান 'বিজয় আনন্দে মুখরিত ক্যাম্পাস' সাপ্তাহিক পূর্নিমা, ১২ ডিসেম্বর-১৯৯০।

মাহমুদ, সাথী 'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের দৃপ্ত ঘোষণা', চিত্রবাংলা, ডিসেম্বর-১৯৯০।

মিজান, মিজানুর রহমান 'শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিব' ঢাকা, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

মুহিত, আব্দুল মাল আব্দুল 'বাংলাদেশ পুর্নগঠন ও জাতীয় ঐকমত্য' ১৯৯১।

রহমান, আতিউর, 'অসহযোগের দিনগুলি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব'- ঢাকা, ১৯৯৮।

রফিক, এ,টি,এম, 'সাপ্তাহিক পুর্নিমা, ঢাকা, ডিসেম্বর-১২, ১৯৯০।

রহমান, সাইদ-উর, 'পুর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন'- ঢাকা, ১৯৮০।

রফিক, সহিদ, 'জনতার জয়-গণঅভ্যুত্থান- ৯০ এর দলিল'- ঢাকা, ১৯৯১।

রহমান, মোস্তাফিজুর, 'স্বৈরশাসনের শেষ ঘন্টা ও ছাত্র ঐক্যের অগ্রযাত্রা'- সন্দ্বীপ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০।

রায়, অজয়, 'গণআন্দোলনের নয় বছর ১৯৮২-৯০'- ঢাকা, ১৯৯১।

সিদ্দিকী, রেজোয়ান, 'সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব' ঢাকা, ১৯৯১।

সেলিম, জাকির হাসান, ' আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী'- চিত্রবাংলা, ডিসেম্বর-১৯৯০।

হান্নান, ডঃ মোহাম্মদ, 'হাজার বছরের বাংলাদেশ, ইতিহাসের অ্যালবাম'- ঢাকা, ১৯৯৮।

হালিম, আব্দুল, 'মানবের তরে মাটির পৃথিবী দানবের তরে নয়'- চিত্রবাংলা, ডিসেম্বর-১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক পত্রিকা

সাপ্তাহিক পুর্নিমা, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯০,

সাপ্তাহিক রোববার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯০,

সাপ্তাহিক রোববার, ৪ নভেম্বর ১৯৯০,

সন্দ্বীপ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০,

চিত্রবাংলা, অক্টোবর ১৯৯০,

চিত্রবাংলা, ডিসেম্বর ১৯৯০,

❑ এরশাদের পতন, বিবিসি সহ বিদেশী গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে, ঢাকা, ১৯৯০।